চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি

(১ম খণ্ড)

(শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-আস্বাদিত পদাবলী)

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্।

—শ্রীশ্রীমহাপ্রভু।

Song is the eloquence of soul and splendid display of lofty imagination that leads to the realm of God.—

Westminster Review.

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

সঙ্কলিত

প্রেমিক-ভক্ত শ্রীমৎ বিহারীলাল রায় মহোদয়ের

প্রযত্নে প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

উৎসর্গ-পত্র

শ্রীধাম-গতা

শ্রীমতী কুমুদিনী দাসী মা জননীর

ভক্তিময় আত্মার

পরিতৃপ্তির জন্য এই শ্রীগ্রন্থ

তদীয়

পরমারাধ্যতম প্রিয়তম পতি প্রেমিকভক্ত

শ্রীমৎ বিহারিলাল রাম

মহোদয়ের অর্থ-ব্যয়ে

প্রকাশিত হইল

ভূমিকা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ৺পুরীধামে শ্রীগম্ভীরামন্দিরে নিরন্তর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলার রসাস্বাদন করিতেন। তদীয় আস্বাদ্য গ্রন্থের মধ্যে আমরা—পাঁচখানি গ্রন্থের নাম বিশেষরূপে শুনিতে পাই যথা :—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক-গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

মহাপ্রভু কীর্ত্তনেই অধিকতর আনন্দ লাভ করিতেন। এই পাঁচখানি গ্রন্থের মধ্যে চারিখানিই অত্যুৎকৃষ্ট গীতি-কাব্য। আমার চিরসুহৃৎ প্রেমিক ভক্ত শ্রীমান্ বিহারিলাল রায় এই কয়েকখানি গ্রন্থকে পরম সমাদর করেন। তিনি বহুল অর্থব্যয় করিয়া বহু যত্নে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থখানকে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী নামে খ্যাত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-প্রণেতা পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি মহাশয়ের প্রণীত শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত টীকার গদ্যবঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। সেই অনুবাদ যেমন সরল, তেমনই মধুর এবং বহুস্থানে স্থানোপযোগি বৈষ্ণব পদাবলী দ্বারা সমলঙ্কৃত। বলা বাহুল্য ইঁহার একান্ত বাসনায় মহাপ্রভুর কৃপায় এই দুরূহ সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ অতীব মধুময় হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থের আরও যে দুই অধ্যায় পূর্ব্বে এদেশে প্রকাশিত ছিল না, বোম্বাই নগরে মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত গ্রন্থ হইতে সেই দুই অধ্যায়ও ইহাতে সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইল। তদ্ব্যতীত বিল্বমঙ্গলকোষকাব্য বলিয়াও বিল্বমঙ্গল রচিত আরও কয়েকটী

পদ্য ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর একটী দুর্ল্লভ বস্তু এই গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হইয়াছে—উহা শ্রীপাদগোপালভট্ট গোস্বামিকৃত শ্রীকৃষ্ণবল্লভানাম্নী শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত টীকা। এই টীকার পাণ্ডুলিপি সমগ্রভারতে দুই খানার অধিক আমরা বহু অনুসন্ধানেও খুঁজিয়া পাই নাই। বহুল প্রয়াসে এই সুদুর্ল্লভ টীকাখানিও এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উপাদেয় ভূমিকা ও গ্রন্থকারের জীবনী প্রভৃতি দ্বারা এই গ্রন্থখানি পরিপুষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের যে কয়েকখানি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে—তন্মধ্যে এই খানিই যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতম তাহাতে কাহারও ভিন্নমত থাকিতে পারে না। ভক্তপ্রবর শ্রীমৎবিহারিলাল রায় মহোদয় সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়া অতীব আগ্রহের সহিত এই গ্রন্থ আমাদ্বারা সম্পাদিত অনূদিত ও টীকার অনুবাদ সহ সমলঙ্কৃত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রাগুক্ত শ্রীগ্রন্থ পাঁচ খানি সবিশেষ যত্ন সহকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ইহাই ইঁহার বাসনা। শ্রীভগবানের কৃপায় সানুবাদ শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকখানিও ইঁহার যত্নে ও ব্যয়ে ইতোমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য সংস্করণ অপেক্ষা এই খানি যে অত্যুত্তম হইয়াছে ইহাও সকলেরই স্বীকার্য্য। ইহার পরে সময়ে সুবিধামত এক খানি অপ্রকাশিত টীকাসহ শ্রীগীত-গোবিন্দ মুদ্রিত করার জন্যও ইঁহার বলবতী বাসনা আছে। শ্রীশ্রীমহা-প্রভুর কৃপা হইলে তাহাতে বহুল প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত হইবে আশা করা যায়।

অধুনা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সুনির্ব্বাচিত বহুল পদ,—ব্যাখ্যা বিবৃতি ও রসাস্বাদ প্রণালীসহ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। যাঁহারা এই সকল পদাবলীর নিষ্ঠাবান্ আস্বাদক ভক্তগণের আস্বাদ্য ও আস্বাদিত বহুল পদ এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হইয়াছে। পদকল্পতরু,

পদসমুদ্র প্রভৃতি প্রাচীন পদাবলী সংগ্রহে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদ রসশাস্ত্রের প্রণালীবদ্ধভাবে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত অধুনা অনেকেই চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থে নানাপ্রকার টীকা টিপ্পনী সহ যত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়াছেন। যে পদকল্পতরু কেবল বটতলার গ্রন্থ প্রকাশকগণেরই কৃপাতেই ভক্ত পাঠকগণের অধিগম্য ছিল, এখন সেই পদকল্পতরু অনেকেই ভাল কাগজে, ভাল অক্ষরে প্রকাশিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ উহা কলিকাতার সাহিত্য পরিষদের প্রযত্নে বহুল অর্থ-ব্যয়ে বিস্তৃত টীকা টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির এমন উত্তম উত্তম সংস্করণ থাকাসত্বেও আমাদের এই প্রয়াস কেন—ইহার একটী কৈফিয়ৎ দেওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। এই কৈফিয়ৎ সম্বন্ধে বেশী কথা না বলিয়া অতিসংক্ষেপেই আমাদের মনোগত ভাব ভক্ত পাঠক মহোদয়গণের নিকটে নিবেদন করিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভক্তপ্রবর শ্রীমৎবিহারীলাল রায় মহাশয় মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের একান্ত ভক্ত। তিনি নিভৃত শ্রীগম্ভীরামন্দিরে যে সকল মধুর রসময় গ্রন্থ আস্বাদন করিতেন সেই সকল গ্রন্থ—সুরসিক ভক্তগণের নিত্য আস্বাদ্য। রসিক ভক্তগণের প্রীতির জন্যই চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে কতিপয় সুনির্ব্বাচিত পদ সঙ্কলন করিয়া তাহারই ভাব-মাধুর্য্য ব্যাখ্যা ও বিবৃতি কিয়ৎ পরিমাণে বিস্তার পূর্ব্বক একখানি গ্রন্থ ভক্তপাঠকগণের সমক্ষে তাঁহাদের আস্বাদনার্থ উপস্থাপিত করা—ইহাই ভক্ত-প্রবর শ্রীমৎ বিহারীলাল রায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ভক্তপ্রবরের উদ্দেশ্য যে অতি মহান্ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার প্রতি এই গুরুতর ভার অর্পণ করা—নিশ্চয়ই ভাল হয় নাই। আমি কোন ক্রমেই এই কার্য্যের উপযুক্ত নই—ইহা

আমি নিজে ভালরূপেই জানি। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠাকুরের সুমধুর পদাবলীতে রসশাস্ত্রের যে সূক্ষ্মতত্ত্ব আছে, সে সূক্ষ্মতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক নৈয়ায়িক বা অপরাপর দার্শনিকগণেরও দৃষ্টিগোচর হওয়া স্বভাবতঃ সম্ভবপর নহে। আমার সর্ব্বদাই মনে হয়, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ঠাকুর—প্রেম রস-শাস্ত্রের সিদ্ধকবি—এই রসের মহাদার্শনিক। ইঁহাদের প্রত্যেক উক্তিতে আবার অতীব ভাবের উৎস বিরাজমান। সে উৎস, সুরসিক প্রেমিক ভক্তেরই দৃশ্য। সেই সুদৃশ্য সুন্দর উৎস প্রদর্শন করিয়া পাঠকগণের জ্ঞান-গোচর করাই—ব্যাখ্যাকারের কর্ত্তব্য। ব্যাখ্যাকারের যদি নিজেরই সে চক্ষুর অভাব হয়, তবে অপরকে তিনি কি প্রকারে তাহা দেখাইবেন। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি খানি রসতত্ত্ব-বিকাশের দার্শনিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের দুই খানি টীকা আছে, একখানি টীকা পূজ্যপাদ শ্রীমৎজীবগোস্বামিচরণ-কৃত—উহার নাম লোচনরোচনী। সুরসিক-কুল-চক্রবর্ত্তী শ্রীমৎবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত টীকার নাম—আনন্দ-চন্দ্রিকা। এই দুই টীকাসহ শ্রীপাদ রূপগোস্বামিচরণকৃত উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ পাঠ করিলে রসতত্ত্বের দার্শনিক তত্ত্বের কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মিতে পারে। কিন্তু উহাতে ব্যুৎপন্ন হইতে হইলে শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপার প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন উহাতে প্রবেশাধিকার লাভই অসম্ভব। গোপীভাবরসামৃতসিন্ধু অগাধ ও অপরিমেয়, উহার তরঙ্গলহরী—অসীম ও অনন্ত। বঙ্গের মহাজনী পদাবলী এই রসামৃত-সিন্ধুরই তরঙ্গ। এই সকল মহাজনী পদকর্ত্তাদের মধ্যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিই শীর্ষস্থানীয়। ইঁহাদের পরম শ্রেষ্ঠতার এক প্রমাণই—যথেষ্ট; তাহা এই যে—মহাপ্রেমরসময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর গম্ভীরার নীরবনিভৃত শ্রীমন্দিরে দিনরজনী ইঁহাদের পদাবলীর মাধুর্য্যামৃত পানে সুদারুণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে শান্তিলাভ করিতেন। ইহাই তাঁহার শান্তিলাভের প্রধান উপায় ছিল। প্রাচীন মহাজনগণও ইঁহাদের পদাবলী পাঠে

শ্রীগোবিন্দের প্রেম-লীলারসের সুধাস্বাদন করিতেন। কেহ কেহ মুক্ত কণ্ঠে ইহাদের কৃতিত্ব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ; যথা—

(১)

জয় জয় চণ্ডী- দাস দয়াময়
মণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যাঁর যশরসায়ন
গাওত জগতজনে ॥
বিপ্রকুলভূপ ভুবনে পূজিত
অতুল আনন্দ দাতা।
যাঁর তনুমন রঞ্জন না জানি
কি দিয়া গড়িল ধাতা ॥
সতত সে রসে ডগমগ নব-
চরিত বুঝিবে কে।
যাঁহার চরিতে ঝুরে পশুপাখী
পিরীতে মজিল যে ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ কেলিবিলাস যে
বর্ণিলা বিবিধমতে।
কবিবর চারু নিরুপম মহী
ব্যাপিল যাঁহার গীতে ॥
শ্রীনন্দনন্দন নবদ্বীপ-পতি
শ্রীগৌর আনন্দ হৈয়া।
যাঁর গীতামৃত আস্বাদে স্বরূপ
রায় রামানন্দ লৈয়া ॥
পরম পণ্ডিত সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব
জিনিয়া যাঁহার গান।
অনুখন কীর্ত্তন- আনন্দে মগন
পরম করুণাবান্ ॥

বৃন্দাবনে রতি যার তার সঙ্গে
সতত সে সুখে ভোর।
রসিক জনার প্রাণধন গুণ
বর্ণিতে নাহিক ওর ॥
চণ্ডীদাস পদে যার রতি সেই
পিরীতি মরম জানে।
পিরীতি বিহীন জনে ধিক রহু
দাস নরহরি ভণে।

(২)

জয় জয় দেবকবি নৃপতি-শিরোমণি
বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডী- দাস রস-শেখর
অখিল ভুবনে অনুপাম ॥
যাকর রচিত মধুর-রস-নিরমল
গদ্য পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌর- চন্দ্র আস্বাদিলা
রায় স্বরূপ সহিত ॥
যবহুঁ যে ভাব উদয় করু অন্তরে
তব গাওহি দুহুঁ মোল।
শুনইতে দারু পাষাণ গলি যায়ত
ঐছন সুমধুর কেলি ॥
আছিল গোপত যতন করি পহুঁ মোর
জগতে করল পরকাশ।
সো রস শ্রবণে পরশ নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব দাস।

যদিও বাঙ্গালার কীর্ত্তনীয়াগণ বহুকাল হইতে এদেশে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী অতি সুন্দর সুন্দর রাগ রাগিণীতে গান করিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দদান করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু অতি অল্প শ্রোতাই

এই সকল পদাবলীর গূঢ় গভীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। প্রথমতঃ স্বীয় হৃদয়ে কবিত্বের ভাব না থাকিলে কবির কাব্যের অন্তস্তলে যে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য লুক্কায়িত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, তাহার সন্ধানই পাওয়া যায় না। কেননা কাব্য-রস-গ্রাহিকা শক্তি যে হৃদয়ে নাই, তাহার পক্ষে কবির বর্ণিত ভাষা কেবল ছন্দে গ্রথিত শব্দ সজ্ঘট্ট বলিয়াই অনুভূত হয়। উহার অন্তরালে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের যে চিত্তচমৎকার জনক উৎস বিদ্যমান থাকে, তাহা এতাদৃশ পাঠকগণের দৃষ্টির সম্পূর্ণ অতীত। সাধারণ ভাবে ইহারা কেবল কর্ণ-সুখদ ছন্দের ও শব্দ লালিত্যেরই কিঞ্চিৎ আস্বাদ প্রাপ্ত হন। সুকবির রসাত্মক বাক্যের অন্তরালে যে গভীরার্থমূলক ব্যঞ্জনা থাকে তাহা তাহাদের বুদ্ধির অতীত।

রসাত্মক বাক্যই কাব্য। রসই কাব্যের আত্মা,—বাক্য উহার শরীর। স্থূলের ভিতর দিয়াই সূক্ষ্মের জ্ঞান হয়। কিন্তু কেবল জড়ীয় দেহের বিবরণ জানিলে যেমন প্রকৃত মনুষ্যতত্ব জানা যায় না, সেইরূপ কেবল ছন্দ ও শব্দের লালিত্যেই কাব্যজ্ঞানের পর্য্যাপ্তি হয় না। সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যদর্পণাদি সাহিত্যদর্শন শাস্ত্রে কাব্য সম্বন্ধে ও রস সম্বন্ধে বহুল বিচার রহিয়াছে। কাব্য যে চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ, গ্রন্থকারগণ ইহারও স্পষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি।
কাব্যাদেব যত স্তেন তৎ স্বরূপং নিরূপ্যতে॥

এই কারিকা লিখিয়াই সাহিত্যদর্পণকার লিখিয়াছেন,—"উক্তঞ্চ—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসুচ।
করোতি কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ সাধু কাব্য-নিষেবণাৎ
কিঞ্চ কাব্যাদ্ধর্ম্ম প্রাপ্তির্ভগবান্নারায়ণ-চরণারবিন্দস্তবাদিনা।

নারায়ণ-চরণাবিন্দ স্তবাদি দ্বারা মুক্তি লাভ হয়—সাহিত্যদর্পণকার ইহাই

বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু শ্রীভগবানের লীলাবর্ণনা যে উৎকৃষ্টতম কাব্য এবং সেই লীলারস-নিষেবণেই যে জীবের মুক্তি হয়, স্বয়ং শ্রীভগবতকার-তো স্পষ্টতই তাহা বলিয়াছেন।

আমার মনে হয়, শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য রসাস্বাদনই শ্রীভগবদনুভবের চরম ব্যাপার। শ্রীভগবান্‌কে প্রেমময় আনন্দময় ও রসময় বলিয়া জানাই—জীবের অনুভবের চরম সীমা। শ্রুতিও এই স্বভাবসিদ্ধ অনুভবেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—"আনন্দং ব্রহ্ম"—"আনন্দমমৃতং ব্রহ্ম"—"রসো বৈ সঃ"। এই সকল মহাবাক্য বিশুদ্ধ অনুভবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ন্যায়ের তর্ক যুক্তি দ্বারা বহিরঙ্গ লোকদিগকে ধর্ম্মের পথে আনয়নের চেষ্টা ফলপ্রদ হইতে পারে, কিন্তু ভগবৎমাধুর্য্যের আস্বাদ দিয়া আনন্দিত করা যায় না। উহা অনুভব সিদ্ধ। সে অনুভবও প্রত্যক্ষ ব্যাপারবিশেষ।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির গীতিকাব্য বিশুদ্ধ প্রেমময় হৃদয়ের সহজ স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস। উহা সাক্ষাৎদর্শনেরই তুল্য—তুল্যই বা কেন—শ্রীভগবানের মধুর লীলা—সাক্ষাৎদর্শনেই ইঁহারা লীলাবিষয়ক পদসমূহ রচনা করিয়াছেন। শ্রীমৎবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শ্লোকগুলিও সাক্ষাৎদর্শনেরই ফল। শ্রীভগবানের লীলারস-সিন্ধুতে নিমজ্জিত থাকিয়াই ইঁহারা নরনারীগণের অশেষ কল্যাণের জন্য এই সকল পদাবলী প্রকাশ করিয়াছেন।

মানবচিত্ত শ্রীভগবানের মধুররসে নিমজ্জিত হইলে সংসার সন্তাপ আর তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহাদের ইতর কামনা দূরীভূত হয়, নরনারীগণ অলৌকিক অতীন্দ্রিয় প্রেমরসামৃত লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। মহাযোগী ও মহাবেদান্তীর চরম লক্ষ্য হইতেও ইহাদের আত্মা অধিকতর আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর

লীলারস-সম্ভোগসাধনা ভগবদুপাসনার যে চরমলক্ষ্য, শ্রুতিবাক্যেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই শ্রুতি-সিদ্ধ প্রেমানন্দরসামৃত লাভের জন্য শ্রীচণ্ডীদাস ও শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী—অতীব উপাদেয় বস্তু; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই এই ভজনপ্রণালী স্বীয় লীলায় প্রকটন করিয়া জীবদিগকে ইহার প্রয়োজনীয়তা ও উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ও শ্রীপাদ বিদ্যাপতির পদাবলী বৃহদাকার গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণ সাহিত্যের হিসাবে নানাপ্রকার যত্নে এই উভয় অমর কবির গ্রন্থ একাধিক ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত করিয়াছেন; তাহাতে কবিদ্বয়ের ও তাহাদের এই দুই গীতিকাব্যের সবিশেষ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এমন কি দুর্ব্বোধ্য স্থলগুলির অর্থ ও ব্যাখ্যা পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে।

সে সম্বন্ধে আমার আর নূতন গবেষণার অবকাশ নাই। সাহিত্যিক ভাবে ইহাদের কাব্য সমালোচনা করাও এই গ্রন্থপ্রকাশের উদ্‌যোক্তার উদ্দেশ্য নহে। প্রেমিক ভক্তগণ ভগবৎ-রসশাস্ত্রের প্রণালী অনুসারে এই দুই প্রেমিক কবির কাব্যসুধার আস্বাদলাভ করেন, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ সন্ধান প্রদান করা—এই গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য। শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের কৃপায় সেই উদ্দেশ্যের বিন্দুমাত্র সিদ্ধ হইলেও আমার এই উদ্যম সফল বলিয়া মনে করিব।

এই গ্রন্থে যে পদাবলী-আস্বাদনের প্রণালী অবলম্বিত হইল, বহুদিন পূর্ব্বে নীলাচলে ব্রজমাধুরী গ্রন্থে তাহার সূচনা করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে অন্যান্য মহাজনদের রচিত পদও প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে কেবল চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিরচিত পদগুলি হইতে অল্প কয়েকটী সুনির্ব্বাচিত পদ দেওয়া হইল। নীলাচলে ব্রজমাধুরী গ্রন্থে এই দুই পদকর্ত্তার যে সকল পদ আছে, এই গ্রন্থে সেই পদগুলি দেওয়া হইল না। নীলাচলে

ব্রজমাধুরী গ্রন্থ খানি ভজনশীল বৈষ্ণবগণের নিকটে যেমন সমাদৃত হইয়াছে, সাহিত্যপ্রিয় নরনারীগণেরও উহার তেমনই আদর করিয়াছেন। সেরূপ হইবারই কথা। ঐ গ্রন্থখানিতে ব্যক্তিগত হিসাবে আমার কোনও গ্রন্থরচনা-প্রয়াস ছিল না। আমি কেবল লেখনীধারণ করিয়া থাকিতাম, অপর কোন শক্তিতে লেখনী পরিচালিত হইত। উহাতে যাঁহার লীলা চিত্রিত হইয়াছে, উহা তাঁহারই অতীব ঔদার্য্যময়ী কৃপার দান। এই গ্রন্থখানি উহারই পরিশিষ্ট বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু পরিশিষ্ট নামের সম্মান ইহাতে কি পরিমাণে পরিলক্ষিত হইবে কৃপাময় পাঠক-পাঠিকাগণই তাহার বিচার করিবেন। চিত্ত ও দেহ এখন অতীব দুর্ব্বল। শ্রীগৌরগোবিন্দর শ্রীচরণারবিন্দের অনুস্মরণ এবং তদ্ভক্তগণের কৃপা অবলম্বন করিয়াই আমার পরম স্নেহাস্পদ ভগবদ্ভক্তপ্রবর শ্রীমং বিহারী লাল রায় মহোদয়ের অকৃত্রিম ভক্তিময় অভিলাষ পূরণার্থ এই কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহাতে আমার কোনও কৃতিত্বপ্রদর্শনের বাসনা নাই। এই গ্রন্থ ভক্ত নরনারীগণের কিঞ্চিৎ প্রীতিপ্রদ হইলেই আমার শ্রমযত্ন সফল হইবে।

আমার আরও কিঞ্চিৎ নিবেদন এই যে ভগবদ্ভক্ত নরনারীগণ এই গ্রন্থপাঠের সময় ভক্তিশাস্ত্র প্রচারপ্রিয় ভক্তপ্রবর শ্রীমান্ বিহারীলাল রায় মহোদয়ের অশেষ কল্যাণের জন্য শ্রীভগবানের চরণে কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করেন। অলমতি বিস্তরেণ।

২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা
বৈশাখ ১৩৩৬ সাল

শ্রীরসিক মোহন শর্ম্মা।

চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি

মঙ্গলাচরণ

শ্রীরাগ।

প্রভু মোর গৌরচন্দ্র প্রভু মোর নিত্যানন্দ
প্রভু সীতানাথ আর।
পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীবাস রামাই
ঠাকুর শ্রীসরকার ॥
মুরারি মুকুন্দ শ্রীজগদানন্দ
দামোদর বক্রেশ্বর।
সেন শিবানন্দ বসু রামানন্দ
সদাশিব পুরন্দর ॥
আচার্য্য নন্দন বুদ্ধিমন্ত খান
ছোট বড় হরিদাস।
বাসুদেব দত্ত রাঘব পণ্ডিত
জগদীশ তার পাশ ॥
আচার্য্য রতন গুপ্ত নারায়ণ
বিদ্যানিধি শুক্লাম্বর।
শ্রীধর বিজয় শ্রীমান্ সঞ্জয়
চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর ॥

পণ্ডিত গরুড় শ্রীচন্দ্রশেখর
হলায়ুধ গোপীনাথ।
গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসুদেব
সুধানিধি আদি সাথ॥
পণ্ডিত ঠাকুর দাস গদাধর
উদ্ধারণ অভিরাম।
রামাই মহেশ ধনঞ্জয় দাস
বৃন্দাবন অনুপাম॥
ঠাকুর মুকুন্দ শ্রীরঘুনন্দন
চিরঞ্জীব সুলোচন।
বৈদ্য বিষ্ণুদাস দ্বিজ হরিদাস
গঙ্গাদাস সুদর্শন॥
গোবিন্দ শঙ্কর আর কাশীশ্বর
রামাই নন্দাই সাথ।
রায় ভবানন্দ- সুত রামানন্দ
গোপীনাথ বাণীনাথ॥
নীলাচল-বাসী সার্ব্বভৌম কাশী-
মিশ্র জনার্দ্দন আর।
শ্রীশিখিমাহাতি রুদ্র গজপতি
ক্ষেত্র সেবা অধিকার॥
গোসাঞি স্বরূপ সনাতন রূপ
ভট্ট যুগ রঘুনাথ।
শ্রীজীব ভূগর্ভ গোসাঞি রাঘব
লোকনাথ আদি সাথ॥

যতেক মহান্ত কে করিবে অন্ত
গৌরাঙ্গ সবার প্রাণ।
গোরাচাঁদ হেন সবে কৃপাবান
প্রেম ভক্তি কয় দান॥
ইঁহা সবাকার যত পরিবার
সন্তান আছয়ে যাঁর।
গৌর ভকত আর যত যত
সবে কর অঙ্গীকার॥
অধম দেখিয়া করুণা করিয়া
সবে পূর মোর আশ।
কাতর হইয়া গুণ সোঙরিয়া
কান্দয়ে বৈষ্ণব দাস॥

পূর্ব্বরাগ।

গম্ভীরা মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে সকল ব্রজভাবে বিভোর থাকিতেন, ত্যাগী সন্ন্যাসী ভিন্ন সে রসাস্বাদন অপরের পক্ষে সম্ভবপর নহে। আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় সেবা ব্রজরস-আস্বাদনের অত্যন্ত প্রতিকূল। পেটে ক্ষুধা, নয়নে নিদ্রা প্রভৃতি যে দেহে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করে, সে দেহ শ্রীগৌরাঙ্গ-গম্ভীরায় বাসের উপযুক্ত নহে। রসনা-জয় ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়-জয় না হওয়া পর্য্যন্ত গম্ভীরার ত্রিসীমায় ঘেঁসিতে অধিকার হয় না—সে রস আস্বাদন করা তো অতি দূরের কথা। শ্রীগৌরের কৃপায় দেহস্মৃতি বিলুপ্ত না হইলে শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলারসামৃত পান করার বাসনা ধৃষ্টতা মাত্র। তাই অনেকদিন সরল ব্যাকুলভাবে শ্রীগৌরাঙ্গচরণে প্রার্থনা করি, দয়া-

ময় গৌর—আমায় গম্ভীরাবাসের অধিকার দাও; যেন তোমার চরণতলে সকল ভুলিয়া পড়িয়া থাকিতে পারি। দেহের সুখ ও ইন্দ্রিয়ের প্রীতি বিরহানলে দহিয়া দহিয়া যেন ছারখার করিয়া দিতে পারি।

দয়াল প্রভু কোন সময়ে দয়া করিয়া এ জীবাধমকে সে অধিকারের বিন্দুমাত্র দিয়াছিলেন; সেই সুদিনে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির বিশ্ববিমোহন পদকীর্ত্তনের অস্ফুট ঝঙ্কার কাণের মধ্যে প্রবেশ করিত, আর আমি অভিভূত হইয়া সেই গীতমাধুরী সুধাস্বাদে বিভোর থাকিতাম। কেমন করিয়া দিন যাইত, রাত্রি হইত, আবার নিশার অবসানে প্রভাত হইত, তাহা সর্ব্বদা বুঝিতে পারিতাম না। হরি, হরি, সেই একদিন, আর এই একদিন! সুখ দুঃখে দিনগুলি কোনরূপে চলিয়া যায়, কিন্তু জীবনের সকল স্মৃতি মুছিয়া যায় না। গম্ভীরার সুখস্মৃতি এখনও কিছু কিছু মনে আছে।

ফাল্গুনের পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় এখন যেমন গম্ভীরা-মন্দিরে চব্বিশপ্রহর কীর্ত্তনানন্দ আস্বাদন করা যায়, তখন এরূপ ছিল না। গম্ভীরা মন্দিরের বাহিরে এককোণে বসিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি জপ করিতেছিলাম। সান্ধ্যরবি কখন অস্তমিত হইলেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই। কিছুকাল জপের পরে শ্রীভগবান্ এ দীনকে যেন লীলার ভিতরে টানিয়া লইলেন; দেখিলাম, শ্রীপাদ রামরায় ও স্বরূপ শ্রীমৎরূপগোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া গম্ভীরামন্দিরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরূপ ঢল ঢল সজল-নয়নে মহাপ্রভুর চরণে দণ্ডবৎ অষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। মহাপ্রভু অতীব স্নেহভরে রূপের মস্তকে শ্রীকরকমল প্রদানে তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। শ্রীরূপ মস্তক অবনত করিয়া নীরবে সলজ্জভাবে বসিয়া রহিলেন। রামরায় শ্রীরূপের হাত ধরিয়া বলিলেন—শ্রীপাদ, প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রভু, আপনাকে রসতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন, আজি এই বাসন্তী-পূর্ণিমা

সন্ধ্যায় আপনার নিকট শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের রসময়ী কথা কিঞ্চিৎ শুনিতে ইচ্ছা করি। রামানন্দের কথায় সায় দিয়া স্বরূপ বলিলেন,—এ অতি সুন্দর প্রস্তাব; প্রভু নিশ্চয়ই তাহাতে আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই। লোকে শুকপাখীকে কৃষ্ণনাম শিক্ষা দিয়া তাহার মুখে সুধা-মধুর কৃষ্ণনাম শ্রবণ করে এবং তাহাতে আনন্দলাভ করে, কলকণ্ঠ-শিশুর অস্ফুট ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাক্যেও পিতামাতার হৃদয়ে আনন্দের উদয় হয়। আজ শ্রীরূপের মুখে মধুর কথা শুনিয়া প্রভু যে আনন্দিত হইবেন, ইহা নিঃসন্দেহ।

প্রভু বলিলেন, স্বরূপ, তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। রূপ আমার মনের সকল কথাই বলিতে পারে।

শ্রীরূপ সলজ্জভাবে বলিলেন আমি ভালরূপেই জানি যে, আমি কিছুই জানি না। তবে যে কেন প্রভু আনন্দলাভ করেন, তাহার কারণ আছে; সে কারণ শ্রীপাদস্বরূপ অতি উত্তমরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। শুকপাখীকে বা শিশুকে বাক্য শিক্ষা দিয়া উহার মুখে সে বাক্যের পুনরুচ্চারণ শ্রবণ করা,—একপ্রকার সুখকরই বটে। আমি অত্যন্ত অধম, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এ অধমের হৃদয়েও প্রভুর শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। আজ সারাবিকাল আমি কেবল ব্রজের পূর্ব্বরাগের কথা ভাবিতে ছিলাম। ব্রজের পূর্ব্বরাগ যে কি মধুর, তাহা বলিবার কোন ভাষা আমার জানা নাই। প্রয়াগে প্রভু এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমি তেমন করিয়া বলিতে পারিব না—বিন্দুমাত্রও সেরূপ হইবে না; কিন্তু এহৃদয়ে যখন ঐ ভাবটী জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার উপরে শ্রীপাদ রায় মহাশয়ের আদেশ—প্রকৃত কথা হয় কি না হয়, আমাকে বলিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে অথবা তাঁহার রূপগুণাদি শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ-লাভের পূর্ব্বে তাঁহাতে যে রতি হয়, তাহার নামই পূর্ব্বরাগ। যে চিত্ত নির্ব্বিকার

ছিল, সেই চিত্তে যখন ব্যাকুলতা জন্মে, সে অবস্থা যাহার ঘটে তিনিই তাহা বুঝিতে পারেন, ভাষার সাহায্যে তাহা অন্যকে বুঝান যায় না। দর্শন ও শ্রবণ সম্বন্ধে প্রভু আমায় অনেক কথাই বলিয়াছিলেন ; যেমন সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রে দর্শন, স্বপ্নাদিতে দর্শন ইত্যাদি। শ্রবণ সম্বন্ধেও ঐরূপ,—যেমন বন্দিমুখে শ্রবণ, দূতীমুখে শ্রবণ, সখীমুখে শ্রবণ, গীতাদিতে শ্রবণ ইত্যাদি। বয়ঃসন্ধির আরম্ভে নির্ব্বিকার চিত্তে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও শ্রবণাদিতে গোপীদের যে মানসিক বিক্রিয়া ঘটিয়া থাকে, উহারই নাম ভাব বা রতি। চিত্ত একক থাকিতে চাহে না। প্রণয়ীর জন্য ব্যাকুল হয়, কিন্তু প্রথম অবস্থায় নায়িকার পক্ষে প্রণয়ের ভাব প্রকাশ করা কিছু কঠিন হইয়া উঠে। লজ্জা, ভয়, ধৈর্য্য কুলাচার প্রভৃতি কুলবধূগণের স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তিরই কার্য্য। সুতরাং রমণী হৃদয়ে প্রণয়ীর অন্বেষণ-বাঞ্ছা বলবতী হইলেও সহসা উহা প্রকাশ পায় না। নায়কের পক্ষে লজ্জার আবরণ না থাকায়, তাহারাই প্রায়শঃ স্ত্রীজনের অন্বেষণ করে ; কিন্তু এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আছে। যদিও স্ত্রীলোকদিগের লজ্জাদির আবরণ নায়ক অন্বেষণে বাধক হইয়া দাঁড়ায়, তথাপি স্ত্রীগণের হৃদয়ে প্রেমের আধিক্য বেশী। সেই প্রেমের স্রোতে লজ্জাদির আবরণ ভাসিয়া যায় ; তাই রসশাস্ত্রকারগণ বলেন ;—

আদৌ রাগে মৃগাক্ষীণাং প্রোক্তা স্যাৎ চারুতাধিকা।

অর্থাৎ পূর্ব্বরাগে স্ত্রীজনেরই পুরুষ-অন্বেষণে প্রেমের চারুতা অধিক প্রকাশ পায়। সেইজন্য কবিগণ স্ত্রীগণের পূর্ব্বরাগই পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছেন।

আদৌরাগঃ স্ত্রীয়োবাচ্যঃ পশ্চাৎপুংসস্তদিঙ্গিতৈঃ।

অন্যরূপেও এই কথার ব্যাখ্যা হইতে পারে। তাহা এই যে ভক্তি-শাস্ত্রে ভক্তিকে একটা রস বলিয়া বলা হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়

ভক্তই ভক্তিরসের আশ্রয়। ভক্তেই ভক্তি-রসের প্রথম উৎপত্তি। তৎপরে ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুরাগ জন্মে। ব্রজদেবীগণ ভক্তগণের মধ্যে শীর্ষস্থানবর্ত্তিনী। সুতরাং তাঁহাদেরই প্রথমতঃ পূর্ব্বরাগ জন্মিয়া থাকে। এইজন্য রসশাস্ত্রকারগণ প্রথমেই ব্রজদেবীগণের পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ব্বরাগে সঞ্চারীভাব ও অনুভাবগুলির বর্ণনা না করিলে রসতত্ত্ব পরিস্ফুট হইবে না। ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লম, নির্ব্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা জাগরণ, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু প্রভৃতি পূর্ব্বরাগের স্থায়ীভাব।" মহাপ্রভু বলিলেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কি নিদারুণ প্রভাব—ইহার বিন্দুমাত্র হৃদয়ে প্রবেশ করিলেও একেবারে প্রমত্ত করিয়া তুলে।" স্বরূপ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, তুমিই তো উহার উদাহরণ। "প্রেম হৃদয়ে প্রবেশ করে" এ কথাই বা বল কেন? প্রেমই তো হৃদয়ের মূল উপাদান, সে প্রেম আত্মনিষ্ঠ বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ কথা-শ্রবণে বা শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-দর্শনে হৃদয়ে উহা জাগিয়া উঠে। প্রভু বলিলেন, তুমি অতি সুপণ্ডিত, অতি সহজ কথায় আমার মস্ত একটা ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলে। আমি "জাগাইয়া তোলা" অর্থেই প্রবেশ পদের ব্যবহার করিয়াছি। যাহা হউক বয়ঃসন্ধিতে নির্ব্বিকার চিত্তে পূর্ব্বরাগের ভাব জাগিয়া উঠে। তুমি বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধিভাবসূচক একটী পদ-গান শুনাইলে বোধ হয় সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন—কি বল রামরায়। রায় মহাশয় বলিলেন, অতি সত্য কথা। স্বরূপ ঠাকুর পদ না গাইলে কোনও পদ আপন মূর্ত্তি প্রকাশ করে না। প্রভু ভালই আজ্ঞা করিয়াছেন। স্বরূপ ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া গাইলেন—

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণ চপলতা লোচন নেল॥

করু দুহু লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ॥
অব অনুখন দেই আঁচরে হাত।
সগর বচন কহু নত করু মাথ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরী করু অবলম্ব॥
হাম অবধরলু শুন বরকান।
শুনহ অব তুহু করহ বিধান॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা-পরমাণে॥

শ্রীরূপ মস্তক নত করিয়া সলজ্জভাবে গান শ্রবণ করিতেছিলেন; গান শেষ হইলে পর অতি মৃদুকণ্ঠে শ্রীরূপ বলিলেন, বিদ্যাপতি ঠাকুরের এই পদ যেন প্রত্যক্ষ দেখা. ইহার প্রত্যেক বাক্য শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি-কালোচিত রূপ-মাধুর্য্য নয়ন-সমক্ষে উপস্থাপিত করে। ইহার উপরে শ্রীপাদের ভাব-মিশ্রিত কণ্ঠস্বরে প্রকৃতপক্ষেই শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধিকালোচিত রূপলাবণ্য ও অন্তরের ভাব একেবারে পরিস্ফুট করিয়াছে। কবির কাব্যরস, গানে মূর্ত্তিমান্ হয়। ইহা অনুভব করাও শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপা-সাপেক্ষ। প্রভু হাসিয়া বলিলেন, শ্রীরূপ, তুমি ও রামরায় শ্রীবৃন্দাবনের কবি। তোমাদিগকে আমি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-নির্ম্মাল্য বলিয়াই মনে করি। স্বরূপের কথা বলিতেছ; আমি আর কি বলিব, স্বরূপ আমার প্রাণ-দাতা, স্বরূপ না থাকিলে আমি বিরহে বিরহে মরিয়া যাইতাম। স্বরূপের গানে আমি শ্রীরাধাগোবিন্দলীলা সাক্ষাৎ করি; তাতেই মৃতদেহে প্রাণ পাই।

যাহা হউক, এখন পূর্ব্বরাগের কথা বলিতেছি,—উহার সঞ্চারী ভাব-

গুলি কি দারুণ! গোপীর হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হওয়া মাত্রেই পূর্ব্বরাগের সঞ্চারীভাবগুলি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় একের পর অন্যটী অথবা যুগপৎ দু'চারিটী সহসা আসিয়া প্রাণ আকুল করিয়া তোলে। পূর্ব্বরাগে বিরহের ভাবগুলি বর্ত্তমান থাকে। গোপীর হৃদয় প্রেমময়, রসময় ও আনন্দময় শ্রীগোবিন্দের জন্য নিরন্তর ব্যাকুল; পূর্ব্বরাগে উহার প্রথম উন্মেষ; সাধক জীবদিগকে গোপীপ্রেম-সমুদ্রের এই তরঙ্গ দেখাইয়া দিতে পারিলে তাহাদের অনন্ত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। কৃষ্ণপ্রেমরসামৃতের বিন্দুমাত্রও আস্বাদন করিতে হইলে গোপীভাবের অনুভব অত্যন্ত প্রয়োজন।

শ্রীরাধা কোন প্রকারে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিতে পাইলেন কিংবা কোন প্রকারে তাঁহার দর্শন পাইলেন, আর অমনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল।

পাইলে শুনিনু যবে শ্যাম দুই আখর
তৈখন মন চুরি কেল।

এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। শ্যামনাম-শ্রবণমাত্রই এই দুটী অক্ষরে শ্রীরাধার মন বিষয় হইতে অপহৃত হইল। তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন, তাঁহার চিত্ত, নামীর অনুসন্ধানে ব্যাকুল হইল; নামের কি অদ্ভুত প্রভাব! আমি বহুবার স্বরূপের মুখে চণ্ডীদাস ঠাকুরের একটী গান শুনিয়াছি,—

"সখি, কেবা শুনাইল শ্যামনাম,
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

ভাবরসের মাধুর্য্য ভিন্ন এরূপ অবস্থা হয় না। বেদ বলেন শ্রীকৃষ্ণ মধুময়, তাঁহার সৃষ্ট এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও মধুময়।

তাই বেদের একটী মন্ত্র এই :—মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। ইত্যাদি

যিনি বিশ্বের বীজ, তিনি মধু। এইজন্য তাহা হইতে প্রসূত এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও মধু। যাহারা এ মাধুর্য্য-সাগরে নিমজ্জিত, জগতের কোনও নিরানন্দ কখনও তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে মধুর বলিয়াই জানেন। গোপীভাব-বিভাবিত শ্রীবিল্ব-মঙ্গল তাঁহার কর্ণামৃতে অন্য কোন কথা না বলিয়া একটী পদ্যে কেবল—"মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্" বলিয়াই মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। শৃঙ্গার-রসে মধুরা রতিই স্থায়ীভাব। মাধুর্য্যের আকর্ষণ ভিন্ন চিত্তের এমন টান হয় না। এই মধুরা রতি মহাযোগেশ্বরের হৃদয়েও পরিলক্ষিত হয় না; কিন্তু ব্রজবালারা এই মধুর রতিতেই গড়া—তাঁহারা এই মধুর রতিরই মূর্ত্তিমতী দেবতা। তাঁহাদের কৃপাভিন্ন শ্রীগোবিন্দের মধুর উপাসনায় প্রবেশলাভ অসম্ভব। অভিযোগ, স্বাভিযোগ, প্রভৃতি দ্বারা এই মধুরা রতির আবির্ভাব হয়। অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ (পদ-চিহ্ন গোষ্ঠপ্রিয়াদি), উপমা, ও স্বভাব—এই সকল মধুরারতি-আবির্ভাবের হেতু। ভাবের প্রকাশই অভিযোগ। ইহা নিজের দ্বারা হইতে পারে, অপরের দ্বারাও হইতে পারে। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পাঁচটীকে বিষয় বলে। ইহারাও মধুরারতির আবির্ভাবের কারণ। এই সকল বিষয়ের উদাহরণ শ্রীরূপ নিজে অতিসুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধবের "একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি" শ্লোকটী আমরা বহুবার আস্বাদন করিয়াছি, কি বল রামরায়। রামরায় আগ্রহসহকারে বলিলেন, আবারও আমার সেই শ্লোকটী শুনিতে সাধ হয়। যতবার শুনি, ততবারই নূতন বলিয়া মনে হয়। শ্রীরূপ, আপনার মুখে সেই শ্লোকটী শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।" শ্রীরূপ স্বভাবতঃ লজ্জাশীল, তিনি লজ্জায়

মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। অতি উৎসাহের সহিত স্বরূপ বলিলেন, উনি লজ্জিত হইতেছেন। ভাল, আমিই উহার আবৃত্তি করিতেছি। এই বলিয়া স্বরূপ অতীব মধুর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ সকৃদ্বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী॥

এটী শ্রীকৃষ্ণনাম-মহিমার উদাহরণ। রামরায় বিস্মিতভাবে বলিলেন, মধুর, মধুর, অতিমধুর! ইহা যে মধুরারতির আবির্ভাবের কারণ হইবে তাহার আর সন্দেহ কি? প্রভু বলিলেন এইরূপে সম্বন্ধও মধুরারতি আবির্ভাবের হেতু অর্থাৎ কুল, রূপ, শৌর্য্য, বীর্য্য ও সৌশীল্য প্রভৃতিতেও মধুরারতির উৎপত্তি হয়, অভিমানও এই রতির হেতু। এস্থলে অভিমান শব্দটার একটা পারিভাষিক অর্থ আছে। উহার ব্যাখ্যা এইরূপ, "শ্রীকৃষ্ণের ভূরি ভূরি রমণীয় বস্তু আছে, থাকুক, কিন্তু আমার পক্ষে এই একটী বিশেষ গুণই প্রার্থনীয়"—এইরূপ নিশ্চয় করাকে অভিমান বলা হয়। শ্রীরূপের লিখিত একটী উদাহরণের মর্ম্ম সংক্ষেপে বলিতেছি। শ্রীরাধার প্রেম-পরীক্ষার্থ নান্দীমুখী পরিহাস করিয়া শ্রীরাধাকে বলিলেন, সখি, কৃষ্ণ বহুবল্লভ, প্রেমশূন্য, তাঁহার স্বভাব অতি রুক্ষ। তিনি স্ত্রীলম্পট। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন মহাগুণবান্ পুরুষকে আশ্রয় কর;—ইহা শুনিয়া শ্রীরাধিকা অতীব দৃঢ়ভাবে বলিলেন, এই জগতে মহাগুণশালী যত পুরুষই থাকুক না কেন, পতিম্বরা রমণীগণ তাহাদিগকে বরণ করেন, করুন; কিন্তু যাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ, মুখে মুরলী, দেহে গৈরিকাদির তিলক—এমন রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আমি ঐসকল ব্যক্তিকে তৃণতুল্য বলিয়াই মনে করি না।" ইহা অভিমানের দৃষ্টান্ত।

এইরূপ অভিমানের আরও বহু হেতু আছে। যেমন কৃষ্ণের পাদচিহ্ন গোষ্ঠ, তাঁহার প্রিয়জন, তাঁহার উপমা ইত্যাদি, এস্থলে আরও দু'একটী কথা বলিতেছি। উহা হইতেছে স্বভাব; যাহা স্বতঃই আবির্ভূত হয়, তাহাকেই স্বভাব বলে। এই স্বভাব নিসর্গ ও স্বরূপভেদে দ্বিবিধ। সুদৃঢ় অভ্যাস-জনিত সংস্কারকে নিসর্গ বলে। গুণ, রূপ প্রভৃতি শ্রবণ দ্বারা এই অভ্যাস-জন্য-সংস্কার জন্মিয়া থাকে। বহুবার রূপ-দর্শনে ও গুণের কথা শ্রবণে এবং রূপের কথা শ্রবণে চিত্তে এক প্রকার সংস্কার জন্মে। সেই সংস্কার প্রথম বিচারে আত্মনিষ্ঠ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু উহা আত্মনিষ্ঠ নহে। শ্রীকৃষ্ণ অতি সুন্দর, তিনি প্রেমময় ও রসময়। তাঁহার মত কেহ ভালবাসিতে জানে না, ইত্যাদি কথা শুনিতে শুনিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সুদৃঢ় অভ্যাসজনিত সংস্কার-নিবন্ধন মধুররাগের আবির্ভাব হয়, উহা স্বাভাবিক; স্বাভাবিক হইলেও রূপগুণাদি শ্রবণই উহার হেতু। যদি শ্রীকৃষ্ণে তাদৃশ রূপ বা গুণের বিদ্যমানতা না থাকে, তাহা হইলে ঐ রতি তিষ্ঠিতে পারে কি না, তাহাই চিন্তনীয়।

নিসর্গ ও স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু সূক্ষ্ম আলোচনা আছে। মানুষ সুদীর্ঘকাল কৃষ্ণের রূপের ও গুণের কথা শুনিতে শুনিতে সুদীর্ঘকালের সুদৃঢ় অভ্যাসজনিত সংস্কার লাভ করে, তখন সে স্বভাবতঃই শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসে। এই ভালবাসার জন্য তাহাকে কোন প্রয়াস পাইতে হয় না। যেমন শ্বাস প্রশ্বাস, বিনা যত্নেই প্রবাহিত হয়, হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন-প্রসারণ-ক্রিয়া যেমন স্বতঃই সংসাধিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিও সেই প্রকার স্বভাব হইতে সংসাধিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের শ্বাস অথবা হৃৎপিণ্ডের যেরূপ স্বতঃসিদ্ধ সুনিয়মিত সুশৃঙ্খল গতিক্রিয়া দৃষ্ট হয়, বহু বহু জন্মের পূর্ব্বে এই সকল যন্ত্রের সেরূপ স্বাভাবিক সুশৃঙ্খলা ছিল না। দীর্ঘকাল নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতে দেহ যন্ত্রাদির এরূপ সুনিয়মিত সুশৃঙ্খলা সম

স্থিত স্বাভাবিক গতিক্রিয়াপ্রণালী সম্বন্ধীয় সংস্কার সুব্যবস্থিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণরতিও সেইপ্রকার বহুজন্মের সাধন-ফলে সুদৃঢ় অভ্যাসজনিত সুপ্রণালীবদ্ধ সংস্কারে পরিণত হয়, নরনারীর আত্মা তখন শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনা ভিন্ন অন্য কিছুই চাহে না। তাহাদের সমগ্র দেহবৃত্তি, ইন্দ্রিয়-বৃত্তি, মনোবৃত্তি, চিত্তবৃত্তি একেবারে কৃষ্ণোন্মুখ হয়; তখন সাধন-বলে কৃষ্ণোন্মুখ করিতে হয় না। উহা স্বতঃসিদ্ধ সংস্কারে পরিণত হয়, ইহারই নাম নিসর্গ রতি।

স্বরূপরতিও এইরূপই বটে, কিন্তু তাহাতে কোন জন্যতা নাই। নিসর্গরতিতে, যেমন রূপগুণাদি দর্শন ও শ্রবণবশতঃ দৃঢ় অভ্যাস জন্মে, সেই দৃঢ় অভ্যাস হইতে সংস্কারের আবির্ভাব হয়, স্বরূপ রতিতে সেরূপ দর্শন ও শ্রবণাদির কোন আবশ্যকতা থাকে না। উহা আত্মার স্বরূপনিষ্ঠ স্বভাব। শ্রীরাধা এবং অন্যান্য প্ররূঢ়ভাব-সম্পন্না ব্রজবালাদের এইরূপ স্বরূপনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি; তাঁহারা স্বভাবতঃই শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ তাহার কারণ নহে। ইহার অপর নাম—সমর্থারতি। শ্রীমতীরুক্মিণীপ্রভৃতি দ্বারকাস্থ মহিষী গণের এইরূপ স্বরূপনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণরতি পরিলক্ষিত হয় না। রূপ-গুণ-দর্শন-শ্রবণে তাঁহাদের স্বচিত্তে সুদৃঢ় অভ্যাসবশতঃ প্রীতি-সংস্কার জন্মিয়া থাকে। স্বরূপ রতি ইহার উচ্চ অবস্থা। রসশাস্ত্রকারগণ ইঁহাদের রতিকে সমঞ্জসা রতি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

স্বরূপ, ব্রজবালাদের পূর্ব্বরাগ যে এক মহাশক্তিময় ব্যাপার, তাহা এই মধুরা রতির সঞ্চারী ভাব হইতে বুঝা যায়। যে প্রীতির প্রভাবে বিরহা-বস্থায় শ্রম, ক্লম, বিষাদ, দৈন্য, চিন্তা, জড়তা, নির্ব্বেদ, ব্যাধি, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়, তাদৃশী কৃষ্ণরতির প্রভাব যে কি শক্তিময়, তাহা ভাবিলেও চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়ে।" এই বলিয়া মহাপ্রভু নীরব হইলেন;

তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল বিষাদে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল তাহাতে শ্রম, ক্লম, দৈন্য, চিন্তা, উদ্বেগ প্রভৃতি ভাব যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ কাহারও মুখে কোন কথাই সরিল না। এক মহানীরবতায় উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রই নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় শ্রীপাদ স্বরূপ একটী গান ধরিলেন :—

ধানশ্রী

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়॥
রাই এমন কেন বা হইল।
গুরু দুরুজন ভয় না মানিল
কোথা কি দেবতা পাইল॥
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সংবরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসিয়ে পড়ে॥
রাজার ঝিয়ারি বয়সে কিশোরী
তাহে কুলবতী বালা।
কিবা অভিলাষ বাড়য়ে লালস
বুঝিতে নারি এ ছলা।
তাহার চরিত হেন বুঝি রীত
হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়
ঠেকিলে কালিয়া-ফাঁদে॥

স্বরূপের কণ্ঠ নীরব হইল, মহাপ্রভুর নয়ন-যুগল ক্রমেই অশ্রুপূর্ণ হইতেছিল। গান শেষ হইলে বর্ষার ধারার ন্যায় তাঁহার নয়ন-ধারায় বক্ষ ভিজিয়া গেল। রামরায় প্রভুর আরও নিকটে গিয়া বসিলেন, তাঁহারই বহির্ব্বাসের অঞ্চল দিয়া মহাপ্রভুর শ্রীমুখকমল মুছাইয়া দিলেন। তাঁহার নিজের নয়ন-যুগল হইতেও অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল। স্বরূপের মুখমণ্ডলে গম্ভীর নির্ব্বেদ ও বিষাদের ভাব পরিলক্ষিত হইল। শ্রীরূপ গম্ভীরামন্দিরের এই মহাভাবের লীলা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন; তিনি প্রয়াগে মহাপ্রভুর নিকট রসতত্ত্বের উপদেশ পাইয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু ব্রজরসের পূর্ণমূর্ত্তি ইতঃপূর্ব্বে তিনি আর কখন দেখেন নাই। তিনি দেখিলেন কৃষ্ণানুরাগিণী শ্রীরাধা পূর্ব্বরাগের প্রভাবে সরোবরস্থ বাতাহত কমলের ন্যায় বিচলিত হইতেছেন, আর ললিতা ও বিশাখা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের এই রসময় ভাবপ্রবাহ—গম্ভীরার অতুলনীয় বৈভব। যাঁহারা ব্রজরসে শ্রীগোবিন্দের ভজন সাধন করিতে ইচ্ছুক, এই লীলার অনুসরণ ও অনুধ্যান তাঁহাদের পক্ষে পরম হিতকর। ইহা দেখিয়াই সিদ্ধকবি কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন -

নিজে করি আস্বাদনে শিখাইল ভক্তগণে
মহাপ্রভু দাতা শিরোমণি।

এ দান আর কাহারও দিবার শক্তি নাই। এ জগতে বহু আচার্য্য জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, বহু অবতার উদিত হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ ভিন্ন প্রেমশিক্ষাদানে আর কাহারও সামর্থ্য নাই। যিনি প্রেমের ঠাকুর, তিনি ভিন্ন প্রেমলীলা অন্য কেহই শিক্ষা দিতে বা দেখাইতে সমর্থ নহেন। যিনি শ্রীরাধার রসমাধুর্য্য-আস্বাদনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি ভিন্ন রাধাপ্রেমের মহিমা আর কেই বা দেখাইয়া দিতে পারেন?

গম্ভীরা লীলায় কলির ভক্তগণ কৃতার্থ হইলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে যে উন্নত-উজ্জ্বল-রসময়ী ভক্তি অনর্পিতচরী ছিল, ভক্তগণ এই তিন যুগে সে ভক্তির কোনও সন্ধান পান নাই, দয়াময় প্রভু সেই উন্নত-উজ্জ্বল-রসময়ী গোপীভাবময়ী ভক্তিসুধায় কলির ভক্তগণকে কৃতার্থ করিলেন। পূর্ব্ব-রাগের এমন চিত্তাকর্ষীভাব অন্য কোন কাব্যে বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও আস্বাদনের নিমিত্ত এই গ্রন্থে অতি অল্প সংখ্যক পদ গৃহীত হইবে, ভক্তপাঠকগণ সেই সকল পদেই ব্রজরসের ভাবগুলির প্রতি ভক্তিময়ী দৃষ্টি রাখিয়া নিজ নিজ উপাসনা প্রণালী বুঝিয়া লইবেন।

এখন আবার গম্ভীরার কথা বলিতেছি:—শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ঠাকুরের পূর্ব্বরাগের পদটী শুনিয়া সপার্ষদ মহাপ্রভু কিয়ৎক্ষণের তরে ভাবসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। স্বরূপের গানের ঝঙ্কারে শ্রীরূপের প্রাণে এক নবভাবের উদয় করিয়া দিল। তিনি স্বরূপের পদস্পর্শ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, ঠাকুর, শুনেছি মহাপ্রভু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদে শ্রীরাধা-গোবিন্দলীলা আস্বাদন করেন, চণ্ডীদাস ঠাকুরের পূর্ব্বরাগের পদ-শ্রবণে কৃতার্থ হইলাম। বিদ্যাপতিঠাকুরের শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ-পদ-কীর্ত্তনে যদি মহাপ্রভুর অনুমতি হয়, তবে এ অধম কৃতার্থ হইবে। মহাপ্রভু ইঙ্গিতে স্বরূপকে শ্রীরূপের বাঞ্ছাপূরণের অনুমতি করিলেন। স্বরূপ অতি মধুর কণ্ঠে ভাবে মজিয়া পদ ধরিলেন—

কানু হেরব বড মনে ছিল সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥
তবধরি অবোধী মুগধ হাম নারী।
কি কহি কি বলি কছু বুঝয় ন পারি॥
সাঙন ঘন সম ঝরু দুনয়ন।
অবিরত ধক ধক—

এইটুকু গাইয়া স্বরূপ আর গাইতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ স্তম্ভিত হইল, তিনি বুকে হাত দিয়া অবনত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। সে ভাব দেখিয়া মহাপ্রভু স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি রামানন্দের কণ্ঠ ধরিয়া তাঁহার স্কন্ধে শ্রীমস্তক রাখিয়া অঝোর নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপ দেখিলেন, গম্ভীরায় ব্রজরসের কথা উত্থাপন করাই এক বিষম দায়। ভাব-রসময় শ্রীবিগ্রহগণ সর্ব্বদাই ভাবে বিভোর থাকেন। ব্রজলীলার কোন কথা উত্থাপন হইলেই যমুনা-জাহ্নবীর স্রোতের মত ইঁহাদিগের নয়নে অশ্রুধারা বহিতে থাকে। ভাদ্রের ভরা নদীতে যেমন সামান্য বৃষ্টিপাত হইলে ও সামান্য বাতাস বহিলে উহা তরঙ্গে তরঙ্গে দুইকূল ভাসাইয়া প্রবাহিত হয়, গম্ভীরা মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের অবস্থাও সেইরূপ। শ্রীরূপ এই অবস্থা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বরূপের চরণ ধরিয়া অবনত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। গোবিন্দ দাস সহসা আসিয়া দেখিলেন, গম্ভীরায় মহাবিরহের চিরন্তন স্রোত এখন বন্যার ন্যায় দেখা দিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ কোন কথা না বলিয়া তিনি মহাপ্রভুর পশ্চাৎ-দিকে বসিয়াপড়িলেন, একখানি তালপত্রের পাখা সঞ্চালন করিয়া সকলকে বাতাস দিতে লাগিলেন। রামরায় নীরবে নীরবে অশ্রুপাত করিতে ছিলেন, মহাপ্রভু ধীরে ধীরে রামরায়ের স্কন্ধ হইতে মস্তক উত্তোলন করিলেন, নিজের বহির্ব্বাসে স্বরূপের ও রামরায়ের নয়ন-জল মুছাইয়া দিয়া শ্রীরূপের মস্তক নিজকরে তুলিয়া ধরিলেন এবং অতি কোমল মৃদুল মধুর কণ্ঠে বলিলেন,—

সাঙন ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধক্ ধক্ করয়ে পরাণ॥

শ্রীরূপ, ইহা শুনিয়া কে স্থির থাকিতে পারে, বল? শ্রীরাধা প্রথম অনুরাগেই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী। তখনও কৃষ্ণ-সঙ্গম হয় নাই। মধুময়

আলাপ-সম্ভাষণ পর্য্যন্ত হয় নাই; কেবল কোন রূপে ঈষৎ দর্শনলাভ মাত্রেই এই দশা! "কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ"—যিনি প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, দৈবক্রমে বিজলীর চমকের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা হইল, এই প্রথম দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে বাসনার বেগবতী তটিনী ভাবতরঙ্গে উন্মাদিনীর ন্যায় উধাও প্রবাহিত হইল। সে হৃদয়ে যে কত প্রেম, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসায় শ্রাবণের ধারার মত তাঁহার নয়ন জল প্রবাহিত হইল। হিমালয়ের জমাট বরফ সহসা যেন বিগলিত হইয়া যমুনা-জাহ্নবার আবর্ত্তময় উচ্ছ্বাসে ধাবিত হইয়া চলিল। তিনি "হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, কবে তোমার দেখা পাব", এই বলিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন; ঘাতে-প্রতিঘাতে তাঁহার হৃদয় বিকম্পিত হইতেছিল, ধৈর্য্যের বাঁধ শিথিল হইয়া গেল। শ্রীমতীর, হৃদয় যেন ধসিয়া পড়িল। এই যে হিয়া দগ্‌দগি,—ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি, আমি নিজেকেই সম্বরণ করিতে পারিতেছি না; তোমাদিগকে আর কি বলিব? শ্রীরূপ, ব্রজরস,—মহাতরঙ্গময় এক মহাসমুদ্র। যাহার হৃদয়ে এই সাগর-তরঙ্গের অভিঘাত স্পর্শ করে, সে কথনো স্থির থাকিতে পারে না। সমগ্র জগৎ তাহার কাছে অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়। আমি আমার নয়নসমক্ষে কেবলই কৃষ্ণপ্রেম-উন্মাদিনী সুনীল যমুনাতট-বর্ত্তিনী শ্রীরাধার শ্রীমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। সেই অবিরল নয়নজল, সেই হাহাকার, আর সেই হা-হুতাশ আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। স্বরূপের গানের প্রত্যেকটী বাক্যে আমার হৃদয়ে ব্রজবিরহের প্রলয় প্রবাহ জাগাইয়া তুলিতেছে।" মহাপ্রভুর বাক্য শেষ হইতে না হইতেই স্বরূপ আবার পদ ধরিলেন—

কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পর হাতে দেলা॥

না জানিয়ে কি করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর ॥

স্বরূপ আখর দিয়া দিয়া নিজের হৃদয়ের ভাব উঘাড়িয়া পদটীকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিলেন। শ্রীরূপ বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে জগৎ ভুলিয়া-নিজের দেহস্মৃতি পর্য্যন্ত ভুলিয়া—স্বরূপের পদামৃতগীতি রসসিন্ধুতে নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার স্বভাব-সুলভ লজ্জাশীলতা দূরে গেল, সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর সম্মুখে শ্রীরূপ আর কখনো এরূপ অধীর হন নাই। যদিও সময়ে সময়ে ভাবতরঙ্গে তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইত, কিন্তু কখনও উহা তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিতে পারে নাই। কিন্তু অদ্যকার ভাব অতি বিস্ময়জনক। মহাপ্রভু দেখিলেন, শ্রীরূপ আত্মহারা হইয়াছেন। গায়ক স্বরূপের অবস্থাও তদ্রূপ। শ্রীরামানন্দ ধ্যানমাজ্জিত মহাযোগীর ন্যায় নীরব ও নিস্পন্দ ভাবে গান শ্রবণ করিতেছিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, রাম-রায়, তোমরাও যে রভসে আপন জীউ পর হাতে দিয়া একবারে আত্ম-হারা হইয়া পড়িলে! বিদ্যাপতির পদে যে মন্ত্রশক্তি আছে তাহা আমি ভালরূপেই জানি। কিন্তু রূপের আত্ম-বিস্মৃতি আর কখনো দেখি নাই। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য হইতেই চোরের স্বভাব। শৈশবে যিনি ব্রজের ঘরে ঘরে মাখন চুরি করিতেন,তাহারও পূর্ব্বে একমাস মাত্র বয়সে যিনি পূতনার প্রাণ-চুরি, তাহার পরে তৃণাবর্ত্তের প্রাণচুরি, তাহার পরে অন্যান্য মহাপরাক্রান্ত দৈত্যদানবের প্রাণচুরি করিয়াছিলেন, সরলা অবলা ব্রজবালাদের প্রাণচুরি তাহার পক্ষে কিছুই কঠিন নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইঁহার হাতে কেইবা রভসে আপন প্রাণ সমর্পণ করে? স্বরূপ এতক্ষণ গান রাখিয়া প্রভুর বাক্য কাণ পাতিয়া শুনিতেছিলেন। প্রভু তখন নীরব হইয়া, ইঙ্গিতে পদের অবশিষ্টাংশ গাইয়া শেষ করিবার ভাব জানাইলেন। স্বরূপ প্রভুর ইঙ্গিতে গাইতে লাগিলেন—

এত সব আদর গেও দরশাই
যত বিছরিয়ে তত বিছুর না পাই ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর নারী।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি ॥

এই মত রাধার পূর্ব্বরাগ সম্বন্ধে এই দুই প্রেমিক ভক্তকবির ভক্ত-চিত্তাকর্ষক বহুল পদ আছে, পাঠক মহোদয়গণ তাঁহাদের গ্রন্থ-পাঠে সেই সকল পদাবলীর আস্বাদ লাভ করিবেন। এস্থলে শ্রীশ্রীগৌরগম্ভীরায় পদামৃত আস্বাদনের সঙ্কেত মাত্র প্রদর্শিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

শ্রীরাধায় পূর্ব্বরাগ-বর্ণনার পরে রসশাস্ত্রের নিয়মানুসারে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ সম্বন্ধে এই উভয় কবির কতিপয় পদ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রেমিক ভক্ত পাঠকগণ স্বীয় স্বীয় অনুভব বলে শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দ ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া ধ্যানমজ্জিত হৃদয়ে এই সকল পদসুধার রসাস্বাদন করিবেন।

ঘির বিজুরি বরণ গৌরী
পেখিনু ঘাটের কুলে।
কানড়া ছাঁদে কবরী বাঁধে
নব মল্লিকার মালে ॥
সই মরম কহিয়ে তোরে।
আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া
বিকল করল মোরে ॥
ফুলের গেডুয়া লুফিয়া ধরয়ে
সঘনে দেখায় পাশ।

উচ কুচযুগ বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস ॥
চরণ কমলে মল্ল তাড়ল
সুন্দর যাবক রেখা ।
কহে চণ্ডীদাস হৃদয়ে উল্লাস
পালটি হইবে দেখা ॥

(২)

দেখিয়া মুরতি রূপের আকৃতি
মরমে লাগিল ভাই ।
যেই সে দেখিল তখন হইতে
কিছু না সম্বিত পাই ॥
ধবলী লইয়া আইনু চলিয়া
শুনত সুবল সখা ।
পরাণ আমার করিছে কেমন
কবে পাইব দেখা ॥
কহিল মরম তোমার গোচরে
শুন হে সুবল তুমি ।
মরম বেদন জানে কোন জন
বিকল হইনু আমি ॥
সেই কথা মোর মনে পড়ি গেল
কহিব কাহার আগে ।
কালি হতে মন কেমন করিছে
হৃদয় ভিতরে জাগে ॥

শুইতে না হয় নিঁদের আলিস
ক্ষুধা তৃষ্ণা গেল দূরে।
নিরবধি হৃদে সেই সে ভাবনা
থাকি থাকি মন ঝুরে॥
কি হল অন্তরে হিয়া জর জর
বিঁধিল সন্ধান শরে।
জর জর কৈল পরাণ পুতলি
মন মত্ত হাতী বরে॥
চণ্ডীদাস বলে শুনহ রসিক
নাগর চতুর কান।
হইবে দরশ করিবে পরশ
ইহাতে নাহিক আন॥

(৩)

কামোদ

সজনি ভালকরি পেখনা ভেল।
মেঘমালা সঙ্গে তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আচর খসি আধ বদনে হাসি,
আধহি নয়ন তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আচর ভরি
তদবধি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা, কনক কাটোরা
অতনু কাচলা উপাম।

তারে তরল মন জনু বুঝি ঐছন,
ফাঁস পসারল কাম॥
দশন মুকুতা পাঁতি অধর মিলায়ত,
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা॥
বিদ্যাপতি কহ অতয়ে দুখ রহ
হেরি হেরি না পুরল আশা॥

(৪)

সুহই—

যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই॥
যাঁহা যাঁহ ঝলকত অঙ্গ।
তাঁহা তাঁহা বিজরী তরঙ্গ॥
কি হেরিলো অপরূপ গোরী।
পৈঠল হিয়া মাহা মোরি॥
যাঁহা যাঁহা নয়ন বিকাশ।
তাঁহি কমল পরকাশ॥
যাঁহা লহু হাস সঞ্চার।
তাঁহা তাঁহা অমিয়া বিথার॥
যাঁহা যাঁহা কুটিল কটাক্ষ।
তাঁহি মদন শরে লাখ॥
হেরইতে সো ধনি থোর।
অব তিন ভুবন অগোর॥
পুন ফিরে দরশন পাব।
তব মোহে ইহ দুখ যাব॥

বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুয়াগুণে দেয়ব আনি॥

(৫)

শ্রীরাগ।

সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভব-মঙ্গল
ত্রিভুবন-বিজয়ী-মালা॥
সুন্দর বদন, চারু অরু লোচন,
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনক কমল মাঝে কালভুজঙ্গিনী
শ্রীযুত খঞ্জন মেলা।
নাভি বিবর সঞে, লোমলতাবলী,
ভুজগী নিশ্বাস পিয়াসা।
নাসা খগপতি- চঞ্চু ভরম ভয়ে,
কুচগিরি-সন্ধি নিবাসা
তিন বানে মদন জিতল তিন ভুবন
অবধি রহল দউ বাণে।
বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
সোঁপল তাঁহার নয়ানে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন হে সাঙ্গাতি
ইহ রস কূপ যো জানে।
রাজা শিব সিংহ রূপ নারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণে॥

(৬)

তুড়ি।

নবীন কিশোরী মেঘের বিজরী
চমকি চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী
ততহি উদিত ভেল॥
জনমিয়া দেখি নাই হেন নারী।
ভঙ্গিম রঙ্গিম যখন সে চাহনি
পলে যে মতিম হারি।
অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমরা ধাওয়ে
ঝঙ্কার করয়ে যাই।
অঙ্গের বসন ঘুচায় কখন,
কখন ঝাপই তাই।
মনের সহিতে, মরম কৌতুকে
সখীর কাধেতে বাহু॥
হাসির চাহনি, দেখাল কামিনী,
পরাণ হারানু তাহু॥
চপল ভঙ্গি, অতি সুরঙ্গি,
চাপটিল জীবন মোর।
অঙ্গুলীর আগে, চাঁদ যে ঝলকে
পরিছে উজলি জোর॥
চাহে যাহা পানে বধয়ে পরাণে,
দারুণ চাহনি তার।

হিয়ার ভিতরে কাটিয়া পাঁজরে
বিঁধালে বাণ যে মোর ॥
জর জর হিয়া রহিল পড়িয়া
চেতনা নহিল মোর ।
চণ্ডীদাসে কয় ব্যাধি সমাধি নয়,
দেখিয়া হইনু ভোর ॥

শ্রীপাদ বিদ্যাপতি ঠাকুর ও শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ঠাকুরের পদ-ভাণ্ডার এই রূপ পদরত্নে পরিপূর্ণ। শ্রীগম্ভীরা মন্দিরে এই সকল পদগান-শ্রবণে শ্রীরাধা-ভাব-বিভাবিত—শ্রীগৌরাঙ্গ বিরহ-যাতনার কতকটা শান্তি পাইতেন। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

রামানন্দের কৃষ্ণ কথা স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভু রাখে নিজ প্রাণ ॥

শ্রীপাদ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের পদগুলিও আবেগ উৎকণ্ঠার সহিত গাইয়াছিলেন। উহা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—স্বরূপ, উভয় হৃদয়ে প্রেমের সমান প্রভাব না থাকিলে সে প্রেমে কখনও রস-পুষ্টি হয় না। শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম-লীলার এই বিশিষ্টতা ব্রজরসের কবিগণ অতি উত্তম রূপেই দেখাইয়াছেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে উন্মাদিনী হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যদি নিরাকার নির্গুণ নির্ব্বিকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ন্যায় স্থাণুবৎ নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিতেন সে প্রেমে কখনও রস-পুষ্টি হইত না। প্রেম প্রতিদান চাহে না। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে ভাল বাসেন; তাহার কোনও হেতু নাই—শ্রীকৃষ্ণের রূপের জন্য নয়—গুণের জন্য নয়—কোন প্রকার স্বার্থের আশাতেও নয়—প্রেমের প্রতিদানে প্রেম-প্রাপ্তির জন্যও নয়—তিনি যে শ্রীকৃষ্ণকে ভাল বাসেন, তাহার কোনও হেতু নাই—তিনি তাহাকে ভাল না বাসিয়া

থাকিতে পারেন না—তাই ভাল বাসেন—তাঁহার এই প্রেম—স্বরূপ নিষ্ঠ প্রেম! ইহা রূপজ, গুণজ বা কোনও প্রকার স্বার্থজ নহে। শ্রীকৃষ্ণ যদি ভাল না বাসিয়া শ্রীরাধাকে পদাহত করিয়া যান, তথাপি তাঁহার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছুই চাহে না। চাতকিনী এক বিন্দু জলের জন্য শ্যাম-জলধরের দিকে সারা জীবন চাহিয়া থাকিবে, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠে মরিয়া গেলেও দীর্ঘী, সরোবর বা নদনদী বা সাগরের দিকে ভ্রমেও দৃক্‌পাত করিবে না। মেঘ যদি বারি বিন্দু না দিয়া তাহার মস্তকে বজ্র নিঃক্ষেপ করে, চাতকিনী সাদরে তাহা গ্রহণ করিবে তথাপি মেঘের আশা ছাড়িয়া অন্য দিকে দৃক্‌পাত করিবে না। চাতকিনীর হৃদয় বুঝি শ্রীরাধারএই ভাবের বিন্দুতেই গঠিত,—কি বল, স্বরূপ?

স্বরূপ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, হাঁ প্রভু, কতকটা সেই ভাবেরই বটে?

মহাপ্রভু কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কতকটা কেন, স্বরূপ?

স্বরূপ বলিলেন—চাতকিনী জলের কামনা করে—এ কামনা তাহার আত্মতৃপ্তির জন্য—কিন্তু মেঘের সেবার জন্য নয়। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-লালসার উদ্দেশ্যে—মূলে শ্রীকৃষ্ণসেবাই মুখ্য—আত্ম-তৃপ্তি উহার আনুসঙ্গিক ফল।

আত্মেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা ধরে প্রেম-নাম॥

মহাপ্রভু প্রফুল্লমুখে বলিলেন,—প্রেমরসের সূক্ষ্ম-তত্ত্ব তোমার নিকটেই শুনিতে পাই। তুমি ভিন্ন এ শিক্ষার দ্বিতীয় স্থান নাই। রামানন্দেরও রস-ভাণ্ডার অতি বিশাল, কিন্তু উনি বড়ই কৃপণ,—বঞ্চনায় অতি পটু—জানিয়া শুনিয়াও কিছু বলেন না। কিন্তু তোমার কৃপণতা নাই।

মহাপ্রভুর কথায় স্বরূপ বাধা দিয়া বলিলেন—নিজ দাসকে অত করিয়া বাড়াইবেন না। শ্রীচরণতলে স্থান দিয়া আমায় যে শিক্ষা দিতেছেন,

ইহাই আমার কোটী জন্মের মহতী কৃপার ফল। তবে রায় মহাশয়ের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি সত্য। উনি স্বভাবতঃই গম্ভীর—কিন্তু গোদাবরীর তটেও কি উনি কৃপণতা করিয়াছিলেন—আপনি বলিতে চাহেন? মহাপ্রভু বলিলেন—সে উহার অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া উহার নিকটে সাধ্যসাধন তত্ত্বের উপদেশ পাইয়াছিলাম।

শ্রীরামানন্দ হাত জোড় করিয়া জিভ্ কাটিয়া বলিলেন এ কি কথা প্রভো! দাসকে কি এত অপরাধী করিতে হয়? আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি কি জানি? আপনার সে বাক্যচ্ছটা এখনও আমার মনে আছে। তাহা মুখে আনিতেও হাসি পায়। স্বরূপ বলিলেন—সে অনুনয় বাক্যচ্ছটা শুনিতে আমারও কৌতুহল হইতেছে—প্রভু আপনাকে কি ব'লে ছিলাম।

রামরায় সলজ্জ ভাবে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন আমার মুখে তাহ আসিবে না।"

মহাপ্রভু বলিলেন—সে আর বেশী কথা কি, যথার্থ কথাই বলিয়া ছিলাম :— সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব বলি শুদ্ধ কর মন॥

এতো যথার্থ কথা—কি বল স্বরূপ!

স্বরূপ জোরের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া বলিলেন—এ যথার্থ কথা নয়—কিছুতেই নয়? আপনি কি আবার সন্ন্যাসী" এই বলিয়া স্বরূপ প্রণয়-মধুর নয়নে মহাপ্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—তাঁহার শ্রীমুখ মণ্ডল শ্রীরাধাভাবকান্তিতে যেন শারদীয় জ্যোৎস্নার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

মহাপ্রভু বলিলেন, যাক্ সে কথা। উভয়ের প্রাণে সমভাবে প্রীতি-রস উচ্ছসিত না হইলে প্রীতিতত্ত্বই পরিস্ফুট হয় না। তাই শ্রীরাধার

পূর্ব্বরাগের পদাবলী-শ্রবণের পরে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ অবশ্যই শ্রোতব্য। পদগুলি স্বভাবতই প্রীতিরসের অফুরন্ত উৎস। কিন্তু তোমার গানে ও অক্ষর-যোজনায় উহাদের সরস সুন্দর সজীব মূর্ত্তি হৃদয় পটে প্রতিফলিত হয়। পূর্ব্বরাগের সম্বন্ধে শ্রীরূপ অনেক কথাই বলিয়াছেন, শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপায় তিনি আরও বলিতে পারেন—ইহাই আমার বিশ্বাস। শ্রীরূপের ব্যাখ্যায় স্বরূপের গানে আমরা ব্রজরসের পূর্ব্বরাগ-ব্যাপারের কতকটা আস্বাদ পাইলাম।

পূর্ব্বরাগের ক্রম-বৃদ্ধিতে শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দের—উভয়েরই চিন্তা জাগরণ, উদ্বেগ প্রভৃতি দশটী দশা হয়। ফলতঃ পূর্ব্বরাগের ব্যাকুলতায় মিলনকে নিকটবর্ত্তী করিয়া তোলে। ব্যাকুলতা যত নিকটবর্ত্তী হয় মিলনও তত নিকটবর্ত্তী হয়। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীরাধার ব্যাকুলতার সম্বন্ধে যে কয়েকটী পদ শুনিয়াছি, তাহাতেই তাঁহার বিরহ-যাতনার প্রভাব বুঝিতে পাইয়াছি। এখন শ্রীকৃষ্ণের বিরহাধিক্যের দুই একটি পদ শ্রীরূপকে শুনাইতে হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-বাক্যে শ্রীরূপ অতীব আগ্রহ সহকারে শ্রীপাদ স্বরূপকে বলিলেন—শ্রীপাদ, প্রভুর আজ্ঞায় এ অধম শ্রীবৃন্দাবনবাসী। শ্রীবৃন্দাবন,—লীলা-ক্ষেত্র। এখন এখানেই সেই মধুময়ী লীলা প্রকট হইয়াছেন। আপনারা দয়ার সাগর। শ্রীপ্রভুর ব্যবস্থায় বেশী সময় এখানে অবস্থানের সৌভাগ্য আমার নাই। এই অল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু ভাগ্যে থাকে, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিব। এ বিষয়ে আপনার কৃপাই আমার ভরসা।

শ্রীরূপের বাক্যে আর কাল বিলম্ব না করিয়া এবং আর কোন কথা না বলিয়া শ্রীপাদ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের দশম দশাসূচক একটি পদ গাইয়া শ্রোতৃবর্গকে ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন ; সে পদটি এই :—

এ ধনী এ ধনী বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইনু পুন॥
দেখিতে দেখিতে বাড়ল ব্যাধি।
যত তত করি না হয় সুধী॥
না বাঁধে চিকুর না পরে চীর।
না করে আহার না পিয়ে নীর॥
সোণার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তুহারি নাম॥
না চিনে মানুষ, নিমিষ নাই।
কাঠের পুতুলী রয়েছে চাই॥
তুলা খানি দিলে নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে॥
আছয়ে শ্বাস, না আছে জীব।
বিলম্ব না কর আমার দিব॥
চণ্ডীদাস কহে বিরহ-বাধা।
কেবল মরমে ঔষধ,—রাধা॥

এই গান করার সময়ে বহুবার শ্রীপাদ স্বরূপের কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, তিনি একটানে গান শেষ করিতে পারেন নাই, ভাষা গদ্গদ হইয়াছিল শ্বাসবায়ু স্থগিত হইতেছিল, তিনি নয়ন-জলে বুক ভাসাইয়া কোন প্রকারে গান পরিসমাপ্ত করিলেন।

শ্রীরূপ বিস্মিতভাবে বলিলেন, সংস্কৃত ভাষায় দশম-দশা-বর্ণনাময় যে সকল পদ্য পাঠ করিয়াছি, ইহার সহিত উহার কোনটীরই তুলনা হয় না। চণ্ডীদাসঠাকুর ব্রজরসের সিদ্ধ কবি। প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমান হয় না। অনুমানের কথা দূরে থাকুক, প্রত্যক্ষ দেখিয়াও দশম দশার চূড়ান্ত ভাব

এমন ভাবে বোধ হয় কেহই পরিস্ফুট করিতে পারেন না। প্রেমের এমন প্রভাব বোধ হয় ব্রজ ভিন্ন অন্যত্র একবারেই অসম্ভব। এই প্রেম নরলোকে সম্ভবপর নহে। প্রণয়িনীর বিরহে প্রণয়ীর আহার নিদ্রা ত্যাগ হয়, ইহা শুনিয়াছি, অনেকে হয়তো দেখিয়াও থাকিবেন। বর্ণ পরিবর্ত্তন হওয়াও বিচিত্র নহে। কিন্তু—

না চিনে মানুষ, নিমিষ নাই।
কাঠের পুতুলী রহিছে চাই॥

এ ভাবের তুলনা নাই, এ দৃশ্য এ জগতে অসম্ভব। পূর্ব্বরাগের বিরহের এমন প্রভাব আর কুত্রাপি দেখা যায় না; আর এমন সহজ সরল সংক্ষিপ্ত কথায় মহাভাব-প্রসূত মহাবিরহের এরূপ হৃদয়-বিদারক অদ্ভুত চিত্র আর কোনও কবির কাব্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। শ্রীরাধা-প্রেমে মাতোয়ারা শ্রীগোবিন্দের একি ভীষণ দশা,—শুনিলেই প্রাণ বিদীর্ণ হয়। শ্রীপাদ চণ্ডীদাস এ চিত্র যে কি ভাবে আঁকিলেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না—অতি চমৎকার; ইহার উপরে শ্রীপাদের ভাব-রসময় গীতে এ অধমের পাষাণ চিত্তেও ব্রজরসের এই উৎস শতধা উৎসারিত হইয়াছে।

শ্রীরামরায় বলিলেন, আপনার বর্ণনাও বড় কম নহে—এক একটি পদ্য যেন ব্রজরসের অফুরন্ত বেগময় প্রস্রবণ। এই সকলই, উঁহারই কৃপা—উঁহারই প্রভাব—উঁহারই ভাবের সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি! এই কঠিন কলিযুগে আপনাদের দ্বারা ইনি যে সুদীর্ঘকাল অনর্পিতচরী উন্নত উজ্জ্বল রসময়ী ভক্তির সহস্র সহস্র উৎস সৃষ্টি করিয়া ভক্তি-পিপাসুগণের আন্তরিক তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছেন, আপনি নিজেই উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীরূপ শ্রীমৎ রামানন্দের বাক্য মস্তক অবনত করিয়া শুনিতেছিলেন।

তাঁহার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই বলিলেন, রায় মহাশয় আমি আপনাদের স্নেহের ও দয়ার পাত্র। আপনার শ্রীমুখে এ অধমের প্রতি অত উচ্চ প্রশংসা শোভনীয় নহে। আপনাদের চরণান্তিকে বসিবার যে স্থান পাই, উহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়। শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী শ্রবণে কেন যে মহাপ্রভুর এত আনন্দ হয় আমি এখন তাহার আভাস পাইলাম, শ্রীপাদ স্বরূপ ঠাকুর মহোদয়ের শ্রীমুখে এই সকল পদাবলী প্রকৃতই মূর্ত্তিমান হইয়া উঠেন।

স্বরূপ বলিলেন যদি তাই হয় তবে আরও দুই একটি পদ শুনাই-তেছি। এই বলিয়া শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগসূচক একটি পদ গাহিতে আরম্ভ করিলেন।

কাঞ্চন বরণী কে বটে সে ধনী,
ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে চপলা চমকে
নীল শাড়ী শোভে গায়॥
দেখিতে বদন মোহিত মদন,
নাসাতে দুলিছে দুল।
সুবিশাল আঁখি মানস ভাবিয়া
ছুটিছে মরাল কুল॥
আঁখিতারা দুটি বিরলে বসিয়া
সৃজন করেছে বিধি।
নীলপদ্ম ভাবি লুবধ ভ্রমরা
ছুটিতেছে নিরবধি॥
কিবা দন্তপাতি মুকুতার ভাতি
জিনিয়া কুন্দক কঁড়ি।

সিঁথায় সিন্দূর জিনিয়া অরুণ
কানে কর্ণবালা ঢেঁড়ি ॥
শ্রীফল-যুগল জিনি কুচ যুগ
পাতলা কাঁচলি তাহে।
তাহার উপরে মণিময় হার
উপমা কহিব কাহে ॥
কেশরী জিনি কৃশ মাজা খানি,
মুঠ করি যায় ধরা।
গজকুম্ভ জিনি নিতম্ব বলনি
উরু করিকর পারা ॥
চরণ যুগল জিনিয়া কমল
অলক্তা রঞ্জিত তায় !
মঝু মন তাহে কাহে না ভুলব
মদন মুরছা পায় ॥
কাহার নন্দিনী কাহার রমণী
গোকুলে এমন কে।
কোন্ পুণ্য ফলে বল বল সখা
সে রামা পাইল সে ॥
চণ্ডীদাস বলে ভেবনা ভেবনা
ওহে শ্যাম গুণ মণি।
তুমি যে তাহার সরবস ধন
তোমারি আছে সে ধনী ॥

এই পদটি শুনিয়া শ্রীরামরায় বলিলেন আমি যদি চিত্রকর হইতাম, তবে তুলিতে এইরূপ আঁকিয়া শ্রীরাধার ধ্যানের সুবিধা করিয়া লইতাম।

কি সরস, সুন্দর, সজীব রূপবর্ণন! প্রত্যক্ষ দেখিলেই যে ভাষায় তাহার যথাযথ বর্ণনা করা যাইতে পারে,—ইহা আমার মনে হয় না। কবির লেখনীর ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে অতীত বস্তু বর্ত্তমানে আনীত হয়; ধ্যানের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষবৎ নয়ন সমক্ষে বিরাজ করে, তুচ্ছ কঙ্কাল পূর্ণ লাবণ্য মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যে জগৎ সমক্ষে সজীবভাবে বিচরণ করে,—কবি প্রতিভার এমনই প্রভাব! শ্রীপাদ চণ্ডীদাস এইপদে শ্রীরাধার স্বাভাবিক রূপলাবণ্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে তাহার বর্ণিত রূপের যেমন অলঙ্কার সাজ সজ্জা নাই, তেমনই তাহার স্বভাব-সরল সুন্দর ভাষাতেও কোনও শব্দা-লঙ্কার ব্যবহৃত হয় নাই। তাঁহার লেখনী যেন তুলিকার ন্যায় সহজ সরল কথায় শ্রীমতীর স্বভাবসুন্দর রূপের বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে দর্শক-বৃন্দের ন্যায় পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। একেত শ্রীরাধার রূপ, তাহাতে চণ্ডী-দাস ঠাকুরের প্রসাদগুণবিশিষ্ট কাব্যের ভাষায় বর্ণিত—সকলের উপরে উহা আবার কলকণ্ঠ ভাবরসময়বিগ্রহ শ্রীপাদ স্বরূপঠাকুরের ভাবোচ্ছ্বাসে সংকীর্ত্তিত—যেন সুধার উপরে সুধা!

ইহা শুনিয়া শ্রীরূপ ঈষৎ হাসিয়া রামরায়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া মৃদু মধুর কণ্ঠে বলিলেন, ইহার উত্তরে, আমি বলিতে চাই—ইহার উপরে—আপনাদের ন্যায় রসময় ব্রজজনের এবং স্বয়ং রসময়বিগ্রহ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সমক্ষে এই সঙ্গীত-সুধার অবতারণা! সুতরাং একেবারে মধুরে মধুর অথবা মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্!! শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন শ্রীরামরায় এবং আপনি উভয়েই শ্রীবৃন্দাবনের মহাকবি সুতরাং এ মাধুর্য্য-আস্বাদনের প্রকৃত অধিকারী। তবে আর একটি গান শুনুন। এই গানটি পূর্ব্বরাগময়ী শ্রীরাধার অচেতন-অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ নামের প্রভাব।

গিয়া সে গুণী প্রকার করিল

সুমন্ত্র কহিল কাণে।

কৃষ্ণ মন্ত্র জপ করিতে লাগিল
শুনায়ে রাধার স্থানে।
সেই কৃষ্ণ দেহ দেখিলে যে তেঁহো
হয়েন রসিক রাজ।
সে পঁহু নাগর সুগড় মুরতি
বসতি গোকুল মাঝ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।
এই কুড়িবর্ণ ভেদ জানাইল
পরম স্বরূপ সেহ॥
সেই কৃষ্ণ হয় পরম রতন
সেই হয় প্রাণপতি।
সেই কৃষ্ণ হয় ব্রজের জীবন
গোকুলে গোপীর পতি॥
সেই কৃষ্ণ হয় অখিল শকতি
এই কৃষ্ণ রূপে দেহা।
সেই কৃষ্ণ হয় গোকুল জীবন
যেই জন রাখে লেহা॥
যবে প্রবেশিল কৃষ্ণনাম কর্ণে
তখনি হইল ভাল।
আঁখি দুই মিলি করেতে কচালি.
অচেতন দূরে গেল॥
চণ্ডীদাস বলে চেতন হইল
সেই বৃকভানু বালা।

অঙ্গ মোড়া দিয়া উঠিল চাহিয়া
দূরে গেল যত জ্বালা ॥

পদকর্ত্তৃগণ—প্রেমিক ভক্ত। তাঁহারা কেবল কর্ণ-বিনোদি কাব্য রচনা করেন নাই; প্রাকৃত নায়ক নায়িকার প্রীতিরস বর্ণনও এই সকল পদকাব্যের কবিগণের উদ্দেশ্য নহে। প্রীতি-রসে শ্রীভগবানের সাধনা-প্রণালী প্রদর্শন ও রসাস্বাদ—এই দুই উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট ভাবেই কাব্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীভগবানের রূপ,—ব্রহ্মস্বরূপ। রূপের ধ্যানে হৃদয়ে ব্রহ্মভাব জাগিয়া উঠে, সংসারিক ভোগসুখ বাসনা তিরোহিত হয়, চিত্ত নির্ম্মল হয়, বিষয়বিকারসম্পর্ক প্রণষ্ট হয়, পরিশেষে বিশুদ্ধ চিত্তে শ্রীভগবানের প্রতি রতি-রসের সঞ্চার হইয়া থাকে। শ্রীনামের প্রভাবও এইরূপ। শ্রীভগবানের নামও ব্রহ্মবস্তু। "শ্রীনামমাধুরী" গ্রন্থে বহু শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায় তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। পদকর্ত্তারাও বহু স্থলেই শ্রীকৃষ্ণ নামের মহাপ্রভাব পদ কাব্যে মধুর ভাবে বর্ণিত করিয়াছেন। শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ঠাকুরের রচিত সেই "কেবা শুনাইল শ্যাম নাম" পদটীর কথা স্মরণ করুন। নীলাচলে ব্রজমাধুরী গ্রন্থে আমরা এই পদের আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়াছি। এস্থলে প্রাগুক্ত শ্রীকৃষ্ণ-নামের সঞ্জীবনী-শক্তি-সূচক শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ঠাকুর কৃত পদটিও অতীব প্রগাঢ় ভাবসূচক। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামি মহোদয়ও "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" পদ্যে নামের মহাপ্রভাবেরই মহিমাকীর্ত্তন করিয়াছেন।

সাধারণ প্রীতিরসের কাব্য হইতে পদ কাব্যের এক মহাবিশিষ্টতা এই যে, ইহা মানুষের চিত্তে অতি মধুর ভাবে ভজন-পদ্ধতির শিক্ষা সঞ্চার করে। ইহারা যখন রূপের বর্ণনা করেন, তখন স্পষ্টতঃই বুঝা যায়

শ্রীভগবানের রূপ যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বস্তু। চিত্তে সেই রূপের স্ফূর্ত্তি হইলে ইহাতে জগতের সকল ভোগ সুখের নিখিল বাসনা চিত্ত হইতে দূরীভূত হয়। ভগবানের শ্রীরূপই ব্রহ্ম বস্তু। ব্রহ্ম ধ্যানে যাহা না হয়, রূপের ধ্যানে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ফল লাভ হয়। এসম্বন্ধে মহানাটকে একটি পদ্য আছে; উহা রাবণ-কুম্ভকর্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তিসূচক। পদ্যটি এই :—

কুম্ভ— আনীতা ভবতা যদা পরিণীতা সাধ্বী ধরিত্রীসুতা।
স্ফূর্জ্জদ্ রাক্ষস মায়য়া নচ কথং রামাঙ্গমঙ্গীকৃতম্॥
রাবণ— কর্ত্তুং চেতসি রামরূপমমলং দূর্ব্বাদলশ্যামলং।
তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পয়ং পরবধূ-সঙ্গ-প্রসঙ্গঃ কুতঃ॥

অর্থাৎ কুম্ভকর্ণ রাবণকে বলিলেন, আপনি সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়া আনিয়া আপনার মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। সীতাদেবী যে শ্রীরামের পরিণীতা পত্নী, তাহাতে সতী লক্ষ্মী ইহা আপনার জানাই ছিল। যদি বলেন যে উৎপীড়নে উৎপীড়নে তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারিব এই ধারণা ছিল। কিন্তু আপনার সে ধারণাও তো ভ্রমাত্মক। কেন না, যিনি সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর কন্যা, তিনি সহস্র উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও যে স্বকীয় ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিবেন ইহাতে আর সন্দেহ কি? এই অবস্থায় আপনার পক্ষে আর একটী উপায় ছিল, তাহা এই যে—স্ফূর্ত্তিশীল রাক্ষসী মায়াবলে আপনি তো রামের রূপ ধারণ করিয়া সীতাদেবীকে বশীভূত করিতে পারিতেন।

তদুত্তরে রাবণ বলিলেন ভাই সে কথা আমার মনেও উদিত হইয়াছিল, কিন্তু জান তো কাহার রূপ ধারণ করিতে হইলে সেই রূপের ধ্যান করিতে হয়। আমিও রামের রূপ ধরিব বলিয়া তাহার রূপ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু কৃতকার্য্য হইলাম না কেন না সেই

দুর্ব্বাদলশ্যামল রামরূপ হৃদয়ে চিন্তা করিতে গেলেই পরব্রহ্মপদ পর্য্যন্ত তুচ্ছ হইয়া যায়, পরবধূ-সঙ্গ-প্রসঙ্গ তো অতি দূরের কথা।

শ্রীভগবানের রূপ-চিন্তা—ব্রহ্মসাধনা অপেক্ষাও চিত্তনির্ব্বিকার করার অধিকতর সুগম উপায়। শ্রীনামের প্রভাব,—ব্রহ্ম আরাধনা অপেক্ষাও অধিকতর ফলপ্রদ। ব্রহ্ম আরাধনায় অশেষ অবিদ্যা ধ্বংস হয়—কিন্তু প্রারব্ধ খণ্ডনে উহা সমর্থ নহে। কিন্তু শ্রীনামের প্রভাবে প্রারব্ধ কর্ম্ম পর্য্যন্ত অবসান প্রাপ্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ ও বংশীধ্বনি-শ্রবণেরও ঐরূপ প্রভাব। বিরহবিধুরা শ্রীমতী রাধা, শ্রীকৃষ্ণ-নাম-শ্রবণেও যে শ্রীকৃষ্ণের রূপের স্ফূর্ত্তি অনুভব করেন, প্রাগুক্ত পদে তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল।

শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন বিদ্যাপতি ঠাকুর শ্রীগোবিন্দের রূপানুভব সম্বন্ধে শ্রীরাধার উক্তিতে যে সকল পদ লিখিয়াছেন তাহা অতি ভাবপূর্ণ; দুই একটি পদ গাইতেছি—

এ সখি কি পেখিনু এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি স্বপন-স্বরূপ॥
কমল যুগল পর চান্দ কি মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল॥
তাপর বেড়ল বিজুরী লতা।
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা॥
শাখা শিখর সুধাকর পাতি।
তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ।
তাপর কীর থির করু বাস॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন যোড়।
তা পর সাপিনী বেড়ল মোড়॥

এ সখি রঙ্গিনী কহত নিদান।
পুন হেরইতে কাহে হরল গেয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাণ।
সুপুরুষ মরম তুহু ভাল জান॥

শ্রীপাদ স্বরূপের গানের তাল থামিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীপাদ রূপ অতি মৃদু কণ্ঠে বলিলেন—এই পদটিতে অতি সুন্দর রূপক অলঙ্কার আছে। শ্রীরাধা বলিতেছেন সখি, একি অপরূপ বস্তু দেখিলাম, তুমি শুনিলে মনে ভাবিবে যেন একটা স্বপ্ন। দেখিলাম যেন কমলযুগলের উপরে চাঁদের মালা—তাহার উপরে নব তরুণ তমাল তরু। তাহাতে বিজড়িলতা যেন বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

(এস্থলে কমল যুগল পদের অর্থ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমল যুগল; চাঁদের মালা—নখ-চাঁদের মালা; তরুণ তমাল—শ্রীকৃষ্ণ তনু; বিজড়িলতা—পীতাম্বর।)

এতাদৃশ তরুণ তমাল কালিন্দী তীরে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে।

(শাখার অগ্রভাগ, হাতের অঙ্গুলীর নখ; অরুণ নব পল্লব—হাতের রক্ত রাগে শোভিত, অঙ্গুলিগুলি পল্লবের সহিত উপমিত হইয়াছে। এই পল্লবের উপরে বা শাখাশিখরে সুধাকরপংক্তি বিরাজমান অর্থাৎ নখচন্দ্র গুলি চন্দ্রের রজতশুভ্র কিরণের ন্যায় শোভা পাইতেছে।) তাহাতে আরও দেখিলাম বিপুল বিম্বফলযুগল বিকশিত হইয়াছে। ইহা স্বপ্নের ন্যায় অদ্ভুত বই আর কি? তমালে কখনও বিম্বফল ফলে কি? সেই বিম্বফলের উপরে আবার একটী শুক পাখী বিরাজমান কিন্তু সে শুক পাখীটাও আবার অতি স্থির। (অর্থাৎ বিম্বফলতুল্য ওষ্ঠ যুগলের উপর নাসিকা বিরাজমান, স্থির শুক পাখীটী (নাসিকা) যেন বিম্বফলের (ওষ্ঠের) উপরে উপবিষ্ট উহার উপরে

আবার খঞ্জন যুগল বিরাজমান (খঞ্জন যুগল পদের অর্থ নেত্র যুগল); খঞ্জন যুগলের উপরে আবার সাপিনী বিরাজমানা। এই সাপিনী অর্থ ভ্রূলতা। কেহ কেহ বলেন সাপিনী অর্থ চূড়া। কিন্তু চূড়ার সহিত সাপিনীর রূপকতা সুষ্ঠু নহে। ভ্রূলতার সহিতই সাপিনীর সাম্য সুসঙ্গত হয়।

সখি আমি রূপের দিকে আবার ফিরিয়া চাহিতেই মূর্চ্ছিত হইলাম।

ফলতঃ শ্যামসুন্দরের রূপের এমনই চমৎকারিত্ব যে উহাতে অপর অপর জ্ঞান তিরোহিত করিয়া দেয়। চিত্তে কেবল তাঁহারই ভুবনমোহন রূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীরূপের বাক্য শ্রবণের সময়েই শ্রীমন্মহাপ্রভু ধ্যানের ভাবে ছিলেন, তাহার সেই ধ্যান ক্রমেই প্রগাঢ় হইল। শ্রীরামরায় স্থির দৃষ্টিতে মহাপ্রভুর শ্রীমুখ পঙ্কজ দর্শন করিতে ছিলেন; শ্রীপাদ স্বরূপ ও রূপ রামানন্দের ন্যায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ধ্যানমজ্জিত বদনসুধাকরের সুধাপানে প্রবৃত্ত হইলেন। গানের ঝঙ্কার ও ব্যাখ্যার ঝঙ্কার থামিতে না থামিতেই গম্ভীরা-মন্দির নীরবতায় ডুবিয়া পড়িল।

শ্রীপাদ রূপ অতঃপরে আবার বলিলেন, প্রভু, শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও বেণুগীত এই দুইটীও তাঁহার মাধুর্য্যের নিদান। শ্রীভগবতের দশম স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়, শ্রীরাসলীলার একটি বিখ্যাত পদ্যে শ্রীমতী ব্রজবালার উক্তিতে লিখিত আছে—

> কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
> সম্মোহিতার্য্য-চরিতান্নচলেৎ ত্রিলোক্যাম্?
> ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্যরূপং
> যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্।

হে অঙ্গ ! তোমার যে রূপ দেখিয়া ও বংশীধ্বনি শুনিয়া গো পক্ষী বৃক্ষ মৃগ পুলক ধারণ করে, ত্রিলোকে এমন স্ত্রী কে আছে যে তোমার সেই কলপদায়তবেণুগীতে সম্মোহিতা হইয়া এবং তোমার সেই ত্রৈলোক্য-সৌভগরূপ নিরীক্ষণ করিয়া পাতিব্রত্যধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয় ?

শ্রীমৎ প্রভুপাদ স্বয়ংও আমায় উপদেশ দেওয়ার সময়ে সংক্ষেপে এই কথাই বলিয়া ছিলেন "মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ"।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের রূপানুরাগের পদাবলী অতঃপরে আপনার নিকট শুনিব। এখন বেণুর মাধুর্য্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গীতি-সুধার আস্বাদ প্রদান করুন।

শ্রীপাদ স্বরূপ তখনই গাইতে আরম্ভ করিলেন :—

কি কহব রে সখি ইহ দুঃখ ওর।
বংশী নিশ্বাস-পরসে তনু ভোর ॥
হঠ সঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজ ॥
বিপুল পুলকে পরি পূরয়ে দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ ॥
গুরুজন সমুখই ভাব-তরঙ্গ।
যতনে হি বসনে ঝাঁপিত সব অঙ্গ ॥
লহু লহু চরণে চলিল গৃহ মাঝ।
দেবে সে বিহি আজু রাখল লাজ ॥
তনুমন বিবশ খসয়ে নীবিবন্ধ।
কি কহব বিদ্যাপতি রহ ধন্দ ॥

সখি, আমায় দুঃখের কি অবধি আছে ? বাঁশীর ফুৎকার যেন মহা-গরলের ন্যায় আমার তনু ও মনকে জীর্ণ করিয়া দিয়াছে। আমি শুনিতে

ইচ্ছা না করিলেও জোর পূর্ব্বক উহা আমার কর্ণে প্রবেশ করে, তখনই আমার দেহ আলুলায়িত হইয়া পড়ে, মন বিচলিত হয়, লাজ ভয় ও ধৈর্য্য তিরোহিত হইয়া যায়—দেহ পুলকে পূর্ণ হয়। কে কোথায় আছে, আমি তাহারও কিছুই বুঝিতে পারি না। কে আমাকে লক্ষ্য করে বা না করে, আমি তাহারও কিছুই জানিতে পারি না। গুরুজনের সমক্ষেই ভাবের এমন তরঙ্গ উছলিয়া উঠে যে আমি তাহা সম্বরণ করিতে পারিনা। কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উদয় হইলেই পুলকচিহ্ন গোপন করার জন্ম বসনে দেহ আবরণ করি। মুহুর্মুহু পা ফেলিয়া গৃহে চাহিয়া যাই—তনু মন বিবশ হয়, নীবিবন্ধ পর্য্যন্ত খসিয়া পড়ে। বংশীর রবে আজ আমার যে দশা হইয়াছিল, তাহা আর কি বলিব? দৈবে বিধি আজ আমার লজ্জা রক্ষা করেছেন। শ্যামের বাঁশির রব শুনিলে আমাতে কি আর আমি থাকি।"

ইহাই বিদ্যাপতির এই পদের মর্ম্ম। ফলতঃ শ্রীভাগবতে শ্রীরাস-লীলার প্রারম্ভেই জানা যায় শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতেই ব্রজবালাকুল আকুল হইয়া সঙ্কেত-স্থানে গমন করিয়াছিলেন। বংশীধ্বনিই নিজজন আকর্ষণের মহামন্ত্র। শ্রীভাগবতে লিখিত আছে—জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্"—এই বাক্যের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিমহোদয় অতীব রহস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ক্লীং পদটী কামবীজ—উহা প্রেমিক ভক্তহৃদয়ে অনুরাগ উন্মেষ করার মহামন্ত্র। কাম শব্দের নিগূঢ় অর্থ—প্রেম। স্থূল জগতে যাহা কাম নামে অভিহিত হয়, তাহার নিগূঢ় সার—অকৈতব প্রেম। প্রত্যেক স্থূল জগতের অন্তরালে সূক্ষ্ম শক্তি অধিষ্ঠিত। যাহা এই জগতে স্থূল মানসিক ক্রিয়ায় কাম রূপে প্রকাশ পায়, উহা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম অবস্থায় প্রেমেরই অবস্থা-পরম্পরার প্রকাশক। এজগতে জীবগণের মধ্যে যে কাম প্রবৃত্তি আছে, তাহার অধিষ্ঠাতৃদেব প্রাকৃত কন্দর্প। অবিদ্যা-কলুষিত ইহ জগতে সূক্ষ্ম শক্তি

স্থূলাকারেই প্রকাশ পায়—উহা অবিদ্যার সম্পর্কে,—অবিদ্যার আবর্জ্জনায় স্থূলাকারে প্রকটিত হয়—কার্য্যেও কলুষ ভাবেই প্রতিফলিত হয়। প্রাকৃত জগতের কামদেব সূক্ষ্মজগতের কন্দর্প দেবেরই স্থূল প্রকাশ—অবিদ্যার গাঢ় ঘন আবরণে সমাবৃত। উহার কার্য্যও সাধুজন-বিনিন্দিত। কিন্তু এই কামদেবও শ্রীবৃন্দাবনের "অপ্রাকৃত নবীন মদনেরই" অতি স্থূলতম প্রকাশ। তাই ব্রহ্ম সংহিতাকার বলেন :—

আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন স্মরতামুপেত্য
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি।

আনন্দচিন্ময় রস পদের অর্থ—উজ্জ্বল প্রেম রস। এই বস্তুটি তৈত্তিরীয় উপনিষদের সেই "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি।" ইনিই স্বকীয় অংশস্ফুরিত পরমাণু প্রতিবিম্বিত রূপে প্রাণিগণের মনে অতি অকিঞ্চিৎ রূপে উদিত হইয়া প্রাকৃত কামরূপে প্রকাশ পান, অবিদ্যা সম্পর্কে দুষ্টবৎ প্রতীয়মান হয়েন, এবং লীলায়িত হইয়া অজস্র ভুবনসমূহকে অভিভূত করিয়া ফেলেন। ফলতঃ চক্ষুর চক্ষু প্রাণের প্রাণ, মনের মন, বুদ্ধির বুদ্ধি আত্মার আত্মাবৎ ইনিই সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ। প্রাকৃত কাম ইঁহারই পরমাণু-প্রতিবিম্ববৎ অবিদ্যা সম্পর্কিত যৎ কিঞ্চিৎ বস্তু।

শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদন ইহ জগতের প্রাকৃত মদনের মহা মোহন সদৃশ। তিনিই মোহন বংশীর মোহন ধ্বনিতে প্রেমিক ভক্তের চিত্তে অনুরাগ জাগাইয়া তোলেন। স্বজাতীয় বস্তুর সম্পর্কে তদাত্ম্য বস্তুর ভাব উন্মেষিত বিকশিত ও বিবর্দ্ধিত হয় ইহাই নিয়ম। শ্যামসুন্দরের বংশীধ্বনিতে ব্রজবালাকুলই ব্যাকুল হন ; সে ধ্বনি তাঁহাদের

কর্ণেই প্রবেশ করে অথবা তদ্ভাববিভাবিত জনগণের কর্ণেই প্রবেশ করে—এমন কি তৎপ্রেমাকৃষ্ট পশু পক্ষীর কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকেও ব্যাকুল করিয়া তোলে এমন কি উদ্ভিদ্ দেহেও পুলকাঙ্কুর পরিলক্ষিত হয়।

এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণেই যাহারা দেহ মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, চিত্তেন্দ্রিয়প্রাণমনআত্মা সকলই সমর্পণ করিয়াছেন, বংশীধ্বনিতে তাঁহাদের দেহে যে পুলকোদ্গম হইবে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? কেবল পুলকোদ্গম কেন, বংশীধ্বনিতে প্রকৃতই ইহারা আত্মহারা হইয়া পড়েন।

বংশীর কলধ্বনি মহাকর্ষণবীজ ক্লীং বীজেরই প্রস্ফোরক। এই বংশীগীত আনন্দবর্দ্ধক, ইহা গোপীগণের চিত্তহারক মহাতস্কর।

শুনিলে বেণুর রব বন মাঝে ধেনু সব
মাথা তুলি ব্যাকুল নয়নে।
ইতি উতি ফিরে চায় তৃণ পত্র নাহি খায়
ছুটে যায় শ্যাম-দরশনে॥
যমুনা উজানে বয় ধ্যানে চিত্ত নাহি রয়
যোগী ঋষি মুনি ছাড়ে ধ্যান।
শাখিশাখে বসি পাখী মুদিয়া থাকয়ে আঁখি
নিচল নীরব অগেয়ান॥
সতী ছাড়ে নিজ পতি লজ্জা ত্যজে কুলবতী
খুলে যায় নীবির বন্ধন।
পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম ভালমন্দ কর্ম্মাকর্ম্ম
ক্ষুণ্ণ হয় সকল নিয়ম॥

মৃত দেহ পায় প্রাণ মূক করে বেদ গান
শুষ্ক তরু শোভে কিশলয়ে।
সুগন্ধি মঞ্জরী ফোটে গুঞ্জরি ভ্রমরা ষোটে
মাতে তারা মকরন্দ পিয়ে॥
ঘন ঘোর বরষায় বসন্ত বহিয়ে যায়
পিক বধূ গায় কল তানে।
জরাজীর্ণ দেহ মাঝে নব রসে প্রাণ রাজে
শ্যামের বাঁশরী সুধা গানে॥

শ্রীরূপ, তোমার নিকটে এসকল কথা বলা আমার ধৃষ্টতা মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তুমি তোমার বিদগ্ধ মাধব নাটকে কত প্রকারেই বা বংশী মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছ। তোমার রচিত বিদগ্ধ মাধবের বংশী মাহাত্ম্য সূচক একটি পদ্য আমি রায় মহাশয়ের নিকটে প্রায়শঃই আবৃত্তি করিয়া থাকি।

শ্রীপাদ স্বরূপের বাক্যপ্রবাহে বাধা দিয়া রায় মহাশয় প্রফুল্ল মুখে বলিলেন—

সেইটি তো—সেই :—

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতি পরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দন-মুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসঃ।
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥

গগনচারী মেঘের গতিরোধ, তুম্বুরুর চমৎকারিতা, সনন্দাদির সমাধিভঙ্গ, বিধাতার বিস্ময়োৎপাদন, ঔৎসক্য উৎপাদনে বলিরাজের ব্যাকুলতা নাগরাজের মস্তক আঘূর্ণণ এবং ব্রহ্মাণ্ডকটাহের ভিত্তি ভেদ করিয়া বংশীধ্বনি সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছিল।" এই পদ্যটী তো?

শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন, মনের ভাব ও মুখের কথা টানিয়া আনিতে আপনি চিরদিনই মহাসিদ্ধ। ঠিক্ এইটাই বটে। বংশীমাহাত্ম্য বর্ণনে এরূপ দ্বিতীয় কবিতা আমি আর কোথাও দেখি নাই।

শ্রীপাদ শ্রীরূপ মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন উহা তো শ্রীপ্রভুরই কৃপা, ইহার সঙ্গে এঅধমের নাম বিজড়িত করা কেন?

এখন শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ঠাকুরের বংশী মাহাত্ম্য সম্বন্ধীয় পদাবলী শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। যদি শ্রীশ্রীপ্রভুর আদেশ হয় এবং আপনাদের কৃপা হয়, তবে এ দীনের সে পিপাসার শান্তি হইতে পারে। শুনিয়াছি শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ঠাকুর শ্রীরাধার বংশী-শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অতি অদ্ভুত লীলা প্রেমিক ভক্তগণের জন্য প্রকটন করিয়াছেন। উহা শুনিতে অতীব কৌতুহল হইতেছে।

শ্রীরূপের আগ্রহাতিশয়ে মহাপ্রভু বলিলেন, উহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। উহা শ্রীমদ্ভাগবতেও গোপ্য রহিয়াছে। স্বরূপের মুখে আমি দুই বার ঐ লীলা-গীতি শুনিয়াছি, কিন্তু কৌতুহলের শান্তি হয় নাই। এখন উহাই শুনা যাউক।

রায় মহাশয় বলিলেন আমার পক্ষে উহা অভিনব বলিয়াই মনে হইবে। বোধ হয় অনেক দিন পূর্ব্বে শুনিয়া থাকিব, এখন তো কিছুই মনে হইতেছে না। আজ শ্রীপাদ শ্রীরূপের আগ্রহে এবং স্বরূপ ঠাকুরের কৃপায় শ্রীশ্রীরাধারাণীর বংশী শিক্ষার লীলাগীতি শুনা যাউক।

শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন যদি সকলেরই ঐ একই আজ্ঞা তবে শুনুন :—

১

রাই বাম করে নাগর শেখরে
ধরিয়া লইল কুঞ্জে।
বসো ধনি রাধে মুরলী শিখাব
এই সে কুটীর কুঞ্জে॥

হরষ বদনী ও মৃগ নয়নী
কহেন হাসিয়া রসে।
দেহ করে বাঁশী ধনী কহে হাসি
বৈঠহ আমার পাশে ॥
যেমতি বাজাও মধুর মুরলী
তেমতি শিখাও মোরে।
শিখালে মুরলী যা চাহ তা দিব
অধীন হইব তোরে ॥
ছাড়ি খল পনা খলের স্বভাব
শিখাহ মুরলী গুণে।
হাসি রস পানে শিখাব যতনে
দ্বিজ চণ্ডী দাস ভণে ॥

২

রসিক নাগর বলে শুন বিনোদিনী।
তোমারে শিখাব বাঁশী আমি ভাল জানি ॥
রাধা কহে কুটীল ছাড়িতে যদি পার।
তবে শুণ শিখাইবে কিছু, বংশীধর ॥
কানু বলে কুটিল যে জানিলে কেমনে।
ধর বাঁশী কহে হাসি শিখাই যতনে ॥
রাই কহে বিনোদ নাগর রসময়।
ভালমতে শিখাইবে আমার মনে হয় ॥
করেতে মুরলী দিলা হাসিয়া হাসিয়া;
মনের হরিষে বাঁশী শিখায় বসিয়া ॥

কানু কহে শুন ধনী আমার বচন।
ত্রিভঙ্গ ভাবেতে কর চরণ স্থাপন॥
চরণে চরণ বেড়ি দাণ্ডাহ ভঙ্গিমে।
অঙ্গুলী ঘুরাও রাধা বলে ঘন শ্যামে॥
কহে চণ্ডীদাস বড় অপরূপ বাণী।
চূড়া বাঁধি মুরলী শিখবে বিনোদিনী॥

গান শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, স্বরূপ ইহা প্রকৃত পক্ষেই অদ্ভুত। নাগররাজ শ্রীমতীকে মুরলী শিক্ষা দিবেন, তাহাতে শ্রীমতীর উপবেশন চলিবে না, দাঁড়াইতে হইবে—সুধু দাঁড়াইলে হইবে না—চরণে চরণ দিয়া তাঁহারই মত ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে!

বাঁশী বাজাইয়া কুলবতীকে ঘরের বাহিরে আনিলেন, তাঁহাদের গৃহকর্ম্ম দেহধর্ম্ম সব গেল, এখন দেখিতেছি স্ত্রীজন-সুলভ-চলন-বলন-বেশভুষা সকলই ছাড়াইয়া লইয়া ঠিক নিজের মত করিয়া লইয়া নিজের বিদ্যা শিক্ষা দিবেন—নাগররাজের একি বিচিত্র লীলা? স্বরূপ হাসিয়া বলিলেন হাঁ প্রভু তাই বটে! কেবল তাহাই নহে—আরও শুনুন :—

৩

নাগর চতুর মণি কহেন একটি বাণী
শুন শুন সুকুমারী রাধে।
দাণ্ডাইতে শিখ আগে, তবে সে ভালই লাগে
তবে বাঁশী শিখাইব সাধে॥
ধরহ আমার বেশ আরোহ চরণ শেষ
পদের উপরে দেহ পদ।
ত্রিভঙ্গ হইয়া রও বাঁশী সনে কথা কও
বাঁশী গাও হইয়া আমোদ॥

শুনিয়া আনন্দ বড়ী সে নব কিশোরী গৌরী
ত্রিভঙ্গিম ভাঙ্গিম সুঠাম।
ধরিয়া রাধার করে নাগর রসিক বরে
অঙ্গুলি ঘুরাইতে শিখান॥
রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে অঙ্গুলী শিখাইছে বনমালী
দেহ ক্রমে সুকুমারী রাধা।
বাজাহ মধুর তান, মন্দ মন্দ কর গান
তিলেকেও নাহি কর বাধা॥
হাসি কহে সুবদনী এবে কি শিখিবে আমি
অলপে অলপে যদি পারি।
কহেন রসিক রাজ বুঝি তুমি পাবে লাজ
চণ্ডীদাস যায় বলিহারী॥

গান শুনিয়া প্রভু হাসিয়া বলিলেন—এযে দেখিতেছি উভয়ে উভয়ের গুরু। রসিক শেখর নাগররাজ নিজ শ্রীমুখেই বলিয়াছেন :—

সহায়াঃ গুরবঃ শিষ্যাঃ ভুজিষ্যাঃ বান্ধবঃ স্ত্রিয়ঃ—ইঁহারা আমার সহায় গুরু শিষ্যা ভোগবিলাসের পাত্রী, বন্ধু ও স্ত্রী। শুনিতে পাই শ্রীরাধা-প্রেমেই শ্রীকৃষ্ণ অধীর ভাবে সতত চঞ্চল চরণে নাচিয়া বেড়ান। রাস নৃত্যে কে যে কাহাকে শিক্ষা দিয়া ছিলেন, তাহাও বলা যায় না। কিন্তু সে যাহা হউক—এখন বংশী-শিক্ষা-লীলা শুনাইয়া শ্রীরূপকে পরিতৃপ্ত কর। শ্রীরূপ আমার,—শ্রীবৃন্দাবন কাব্য-মাধুরীর নিরন্তর রসাস্বাদী, নিজেও প্রেমভক্তিরসের সরস কবি। বংশীশিক্ষা লীলা শুনিয়া ইনি প্রকৃতই আনন্দ পাইতেছেন।

শ্রীপাদ স্বরূপ আর কোনও কথা না বলিয়া বংশীশিক্ষালীলা গান আরম্ভ করিলেন :—

৪

অঙ্গুলি ঘুরিয়া রাই মুরলী মধুর পুর
শুনি যেন শ্রবণ পূরিয়া।
দেহ ফুক ধীরে ধীরে অঙ্গুলী নাড়হ রাধে
তাহা শ্যাম দিছে দেখাইয়া॥
রাই, হের দেখ চাহি মোর পানে,—
রন্ধ্রে, রন্ধ্রে "ও"রা ধ্বনি করের অঙ্গুলি ঢাক
প্রথম রন্ধ্রেতে কর গানে॥
এ বোল শুনিয়া রাই শ্যাম মুখ পানে চাই
ফুঁক দিল সব রস গান॥
না উঠে কোনও গান ফুক ফুঁক পড়ে যেন
হাসি কানু না করে ধরণ॥
পুন কহে সুনাগর শুনহে নাগরী গোরী
নহিল নহিল এনা গান।
পুন দেহ দৃঢ় ফুঁক বাড়ুক অনেক সুখ
পুনঃ ধনি পুরহ সন্ধান॥
কানুর বচন শুনি বৃকভানু-নন্দিনী
কহে রাই বিনয়-বচনে।
প্রথম মুরলী শিক্ষা কেবল হয়েছে দীক্ষা
দ্বিজ চণ্ডীদাস কিছু ভণে॥

৫

পুনরপি রাই মুরলী বাজাই
উঠিল একটি ধ্বনি।
প্রথম সন্ধান উঠিল যখন
কৃষ্ণ কৃষ্ণ উঠে বাণী॥

কহে শ্যাম পর বাজে অপস্বর
না উঠল রাধা নাম।
আগে কহ ধ্বনি রাধা নাম শুনি
তবে সুধা অনুপাম॥
তবে হাসি ধনা রাজার নন্দিনী
কহিছে কানুর কাছে।
মুরলী শিখিতে বড় সাধ আছে
শিখাও আর যে আছে॥
তুমি গুণমণি গুণের সাগর
আমি যে অবলা জনে।
মুরলী শিখালে যাহা চাহ দিব
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

যাহা হউক, আরও দুই একটি পদ গাইতেছি :—

৬

দুহু বাহে মধুর মুরলী।
অপরূপ দুহু রস কেলি॥
একরন্ধ্রে দুজনে বাজায়।
রাধাকৃষ্ণ নাম উঠে তায়॥
রাই কহে শুন নাগর কান।
পূরল মনের অভিমান॥
সাধ ছিল শিখিতে মুরলী।
তাহাও শিখালে বনমালী॥

৭

হেদে হে মুরলীধর না বাস আপন পর
হাসিয়া কহনা এক বোল।
যে ছিল মনের সিদ্ধি তাহা পুরাইল বিধি
মিটে গেল মনের সে গোল॥
মধুর মধুর ধ্বনি গাও নিজে গুণমণি
নিজ মুখে শুনিতে মধুর।
কি জানি কি গাওগুণে বিষ ভরি মুখখানে
শুনিলে দংশয়ে হিয়া মোর॥
যেমন ভুজঙ্গগণ করিলেই দংশন
চেতন গেয়ান নাহি থাকে।
তেমতি তোমার বাঁশী কুল নাশে হাসি হাসি
দংশন করয়ে আসি বুকে॥
কভু বাঁশী প্রেম ধারা কভু বা ভুজঙ্গ পারা
গরল সমান হয় কাণে।
কেন বা এমন হয় অবলা প্রাণে কি সয়
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভাবি ভণে॥

মহাপ্রভু বলিলেন, ইহা অতি সত্য কথা। বল দেখি স্বরূপ, এরূপ বিপরীত ভাব হয় কেন?

স্বরূপ বলিলেন প্রভো, মুরলীধর নিজেই তাহার কারণ বলিয়াছেন, উহা এই :—

৮

হাসিয়া নাগর চতুর শেখর
রাধারে তখন বলে।

কহিল সকল তোমার গোচর
বাঁশীর বচন ছলে ॥
কখন কখন বাজয়ে কেমন
কখন মধুর সম।
কখন কখন গরল সমান
গাইতে ঘটে গো ভ্রম ॥
কোন অভিলাষে বাজয়ে কেমন
না বুঝি ইহার রীত।
মধুর মধুর বাজয়ে সুস্বর
কত না আনন্দের গীত ॥
বাঁশী পরবশ নহে নিজ বশ
কখনো সে নহে ভাল।
বাঁশীর চরিত বুঝিতে না পারি
তুমি বা কি আর বল ॥

শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভু একটুকু আনমনা হইলেন, শ্রীপাদ স্বরূপ পদটী গাইয়া শেষ করিয়া বলিলেন, প্রভো আমার মনে হয় পদকর্ত্তা শ্রীপাদ চণ্ডীদাস বংশীশিক্ষা-লীলা-প্রকটনে কিঞ্চিৎ কার্পণ্য করিয়াছেন। রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ মান, মাথুর, গোষ্ঠপ্রভৃতিলীলায় তিনি তাঁহার যে ভাব ও ভাষার অমৃত বর্ষণ করিয়াছেন, এ লীলায় সেরূপ আস্বাদন-সুখসম্ভোগ করা দুষ্কর বলিয়াই মনে হইল।

মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, তোমার নিকট ও শ্রীরূপের নিকটে সময়ে সময়ে আমার মানসিক ভাব ধরা পড়ে। ভাল, এখন তো গোষ্ঠের সময় অতিবাহিত হয় নাই; গোষ্ঠ লীলাই শুনা যাক্, কি বল শ্রীরূপ? রায় মহাশয়ের বোধ হয় দ্বিমত হইবে না।

রায় মহাশয় ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন দ্বিমত হইলেও বিমত হইবে না বিশেষতঃ দ্বিমত হওয়ারও কোনও কারণ দেখি না। তস্মিন্ তুষ্টে যখন জগৎ তুষ্টং—ইহা চিরদিনেরই বিখ্যাত কথা—তখন আপনার এদাসও তো সেই জগতের ধূলি কণা; এই ধূলি কণাই বা পরিতুষ্ট না হইবে কেন?

শ্রীপাদস্বরূপ অট্ট হাসির রোল তুলিয়া বলিলেন—বহুৎ আচ্ছা! তবে গোষ্ঠের দুই একটি পদ শুনাইতেছি:—শ্রীরাধা সখীর নিকটে বলিতেছেন—সখি শ্রীমতী যশোদা দেবীর হৃদয় কি কঠিন, তিনি কোন্ প্রাণে তাঁহার প্রাণের ধনকে গোষ্ঠে পাঠান—আমার প্রাণে উহা সহ্য হয় না।

সখি কি আর বলিব মায়
তিলে দয়া নাহি তাহার শরীরে
এ কথা বলিব কায়।
মায়ের পরাণ এমনি ধরণ
তাঁর দয়া নাহি চিতে।
এমন নবীন কুসুম কোমল
বনে নাহি পাঠাইতে॥
কেমনে ধাইবে ধেনু ফিরাইবে
এ হেন নবীন তনু।
অতি খরতর বিষম উত্তাপ
প্রখর গগন ভানু॥
বিপিনে যে কত ফণি শত শত
কুশের অঙ্কুর তায়।
সে রাঙ্গা চরণে ছেদিয়া ভেদিবে
মোর মনে এই ভায়॥

আর সব আছে কংসের অরাতি
জানি বা ধরিয়া লয়।
সঘনে সঘনে লয় মোর মনে
সদাই উঠিছে ভয়॥
চণ্ডীদাস কয় না ভাবিও ভয়
সে হরি জগত্-পতি।
তারে কোন জন করিবে তাড়ন
নাহি হেন দেখি কতি॥

শ্রীপাদ স্বরূপ অতীব কোমল কণ্ঠে মধুর স্বরে গানটী গাইলেন। মহাপ্রভু ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে গানটী শ্রবণ করিলেন। গান শেষ হইলেও নয়ন উন্মীলন করিলেন না। শ্রীল রাম রায় ও শ্রীল রূপ, মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-পঙ্কজের প্রতি নির্নিমিষ নয়নে চাহিয়া বলিলেন,—শ্রীরূপ-শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা দেখ, এই প্রেম,—পরম স্নেহময়ী শ্রীমতী যশোদার স্নেহের ন্যূনতা অনুভবে ব্যাকুল হইয়াছে। যশোদাদেবী এমন কুসুম-কোমল সুকুমার তনু গোপালকে গোষ্ঠে পাঠান কেন? নিদাঘের প্রখর তাপ, কঙ্কর কণ্টক-পূর্ণ বনভূমি—এই ভীষণ কঠোর বনভূমে গোপালের কোমল চরণে যে কত ক্লেশ হয়, মায়ের চিত্তে কি সে ধারণার উদয় হইল না?" শ্রীরাধার এই উক্তিটীতে শ্রীশ্রীরাস লীলার গোপীগীতার একটি শ্লোক সহসাই মনে উদিত হয়। সে পদ্যটী এই:—

চলসি যদ্ ব্রজাচ্চালয়ন্ পশূন্
নলিন-সুন্দরং নাথ তে পদম্
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি॥

হে ব্রজেশ্বর, হে কান্ত, তুমি যখন গোচারণের জন্য মাঠে গমন কর, তখন শিলাতৃণাঙ্কুরে তোমার কমল-কোমল চরণে না জানি কতই ব্যথা পাও, তাহা চিন্তা করিয়া আমাদের চিত্ত অতীব আকুল হইয়া পড়ে।

গোপীগীতার শেষ পদ্যটীও এই ভাবাত্মক, তদ্ যথা :—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় ! দধীমহি কর্কশেষু,
তেনাটবীমটসি তদ্ ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কুর্পাদিভি র্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ।

হে প্রিয়, তোমার যে পরম কোমল চরণ-কমল আমরা আমাদের কঠিন স্তনমণ্ডলে ভীত-ভীত ভাবে অতীব সতর্কতার সহিত ধারণ করিতাম, তুমি সেই শ্রীচরণ-কমলে কঠিন তীক্ষ্ণ কণ্টক-কন্দর পূর্ণ বনভূমিতে বিচরণ কর,—শিলাতৃণাঙ্কুরে তোমার শ্রীচরণকমলে না জানি কতই ব্যথা হয় ! ইহা মনে করিয়া আমাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হয়। হে প্রিয়, হে সুন্দর, হে কোমল, হে মধুর তুমি যে আমাদের জীবন ! তুমি যে আমাদের জীবনের জীবন ! তুমি আর বনে বনে ভ্রমণ করিও না ; আমাদের নিকটে এস",—ইহাই অভিপ্রায়।

এই পদ্যটী উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীরূপ মহাভাব প্রকটনের অন্তর্গত একটি উদাহরণ রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহাভাববতী ব্রজদেবীগণের মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা। এই পদ্যটী শ্রীরাধার উক্তি বলিয়াই রসজ্ঞ প্রেমিক ভক্তগণের অভিপ্রায়। শ্রীকৃষ্ণের সুখের স্থলেও তাঁহার ক্লেশের আশঙ্কায় মহাভাববতীগণ খিন্না হইয়া থাকেন। (ইহার সবিশেষ ব্যাখ্যা মৎকৃত শ্রীশ্রীগোপীগীতায় দ্রষ্টব্য)।

মহাভাববতী শ্রীরাধা, এস্থলে মা যশোদার নির্ম্মল ঐকান্তিক স্নেহের উপরেও নিঠুরতার আরোপ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সুকুমার শ্রীগোপালকে

ব্রজের কণ্টক-কঙ্করের পূর্ণ বনে প্রেরণ করেন কেন? শ্রীপাদ চণ্ডীদাস এই পদে শ্রীরাধার মহাভাব লক্ষণের একটি উদাহরণ অতি উত্তম রূপেই পরিস্ফুট করিয়াছেন—কি বল শ্রীরূপ। তোমার উজ্জল নীলমণি গ্রন্থ রচনার বহুপূর্ব্বে, এমন কি আমাদের জন্মেরও বহু পূর্ব্বে নান্নুর পল্লীতে বসিয়া শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ব্রজরসের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া সেই রস-সুধা জীবগণের জন্য পদগানে ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এই পদকর্ত্তা শ্রীভাগবতের গোপী গীতার ভাব লইয়া যে পদ রচনা করিয়াছেন তাহাও মনে হয় না। প্রকৃত কথা এই যে, সিদ্ধ কবিগণের হৃদয়ে ঋষিদের জ্ঞান-প্রভাবের ন্যায় স্বতঃই সমুজ্জল ভাব-রাশি স্ফূর্ত্তি পায়। শ্রীমতী বাশুলী দেবীর সাধনায় শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ঠাকুর এই শক্তিলাভ করিয়াছেন, ইহাও প্রকৃত কথা হইতে পারে। কেন না শ্রীবাশুলী দেবী যোগ-মায়ারই অংশাংবতার বলিয় গণ্যা হইতে পারেন। শ্রীরূপ তুমিও ধন্য, কেন না তোমার উজ্জল নীলমণি গ্রন্থে তুমি এই সকল ভাব আরও বিশদরূপে প্রকট করিয়াছ।" শ্রীপাদ রামরায় ও শ্রীপাদ স্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্যের অনুমোদন করিয়া বলিলেন—সে কথার আর সন্দেহ কি? শ্রীরূপ প্রকৃতই মহাভাগ্যবান্।

ইহা শুনিয়া শ্রীরূপ লজ্জায় মাথা অবনত করিয়া বলিলেন—উহাতে আমার গৌরব আর কি আছে? পাখীকে শ্রীকৃষ্ণ নাম শিখাইয়া তাহার মুখে শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণে পাখী-পালকের যে আনন্দ, দয়াল ঠাকুর এস্থলেও সেই ভাবই প্রকাশ করিলেন। তিনি নিজে যাহা বলিয়াছেন আমি যদি ঠিক তাহার অবিকল প্রতিধ্বনি করিতে পারিতাম, তবে নিজেকে প্রকৃতই সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতাম। তথাপি আমি একথা বলিতে কুণ্ঠিত নহি যে আমার ভাগ্যের সীমা নাই যেহেতু শ্রীপ্রভু তাঁহার শ্রীচরণান্তিকে এ জীবাধমকে স্থান দিয়া অতি দুর্ব্বোধ্য রসতত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন; প্রভুর অনুমতি হইলে এবং শ্রীপাদ স্বরূপ ঠাকুরের

কৃপা হইলে তাহার শ্রীমুখে আরও দুই একটি পদ-শ্রবণে এ অধম কৃতার্থ হইতে পারে।

মহাপ্রভু উৎসাহের সহিত শ্রীপাদ স্বরূপকে আর একটী পদ গাইতে আদেশ করিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ তিলার্দ্ধ কালও বিলম্ব না করিয়া গান ধরিলেন :—

শুন গো স্বজনি সই।
কেমনে রহিব কানু না দেখিয়া
নিশি নিশি যাপি রোই॥
হের দেখ রূপ নয়ন ভরিয়া
করেতে মোহন বাঁশী।
হাসিতে ঝরিছে মোতিম মাণিক
সুধা ঝরে কত রাশি॥
হেন মনে করি আঁচল থাপিয়া
আঁচলে ভরিয়া রাখি।
পাছে কোন জনে ডাকাচুরি দিয়া
পাছে লয়ে যায় সখী॥
এরূপ লাবণ্য কোথাও রাখিব
মোর পরতীত নাই।
হৃদয় বিদারি পরাণ যথায়
সেখানে করেছি ঠাঁই॥
সবার গোচর না করি বেকত
রাখিব যতন করি।
পাছে দিয়া সিঁদ যবে যাই নিঁদ
কেহ না করয়ে চুরি॥

চণ্ডী দাস বলে হেনক সম্পদ
গোপনে রাখিবে বটে।
আছে কত চোর তার নাহি ওর
জানে সিঁদ দিয়া কাটে॥

এই পদটী শ্রবণে মহাপ্রভু বলিলেন, ইহাতে গোষ্ঠের বিরহ-রস উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। মহাভাবময়ী এক বারেই কৃষ্ণ গত প্রাণা। তাহার চিত্তে সর্ব্বদাই বিরহের ভয় জাগিয়া থাকে। সুতরাং বিরহেও দুঃখ, মিলনেও দুঃখ। এই পদটীও অতি উত্তম। তার পরে, স্বরূপ ?

শ্রীপাদ স্বরূপ তখনই আর একটি পদ ধরিলেন—

বদন হেরিয়া গদ গদ হৈয়া
কহে বিনোদিনী রাই।
শুনলো স্বজনি হেন মনে গণি
আন ছলে পথে যাই॥
হেরি শ্যাম রূপ নয়ন ভরিয়া
আঁখির নিমিষ নয়।
এক আছে দেখি গুরু জন রোষ
তাহাই বাসিয়ে ভয়॥
আঁখির পুতুলি তারার সে মণি
যেমন খসিয়া পড়ে।
শিরীষ কুসুম জিনিয়া কোমল
পাছে বা গলিয়া ঝরে॥
ননীর অধিক শরীর কোমল
বিষম ভানুর তাপে।

জানি বা ও অঙ্গ গলি পানি হয়
ভয়ে সদা তনু কাঁপে ॥
কেমন যশোদা নন্দ ঘোষ পিতা
হেনক সম্পদ ছাড়ি।
কেমনে হৃদয় ধরিয়া আছয়
এই ত বিষম বড়ি ॥
ছার খারে যাক্ এ সব সম্পদ
অনলে পুড়িয়া যাকু।
এ হেন ছাওয়ালে ধেনু নিয়োজিয়া
পায় কত সুখ পাকু ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন ধনি রাধা
সকল গুপত মানি।
এ সকল ছলা যাহার কারণে
আমি সে সকল জানি ॥

শ্রীপাদ স্বরূপ সুধামধুর কণ্ঠে পদ গান ধরিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার কণ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া পাড়ল, নয়ন জল গণ্ড বাহিয়া বক্ষ ভাসাইয়া ফেলিল। মহাপ্রভু স্বরূপের প্রতি অনিমেষ দৃষ্টিপাত করিতে-ছিলেন। রাম রায় অতি মধুর স্বরে আপন মনে বলিতেছিলেন, চণ্ডী-দাসের পদে ঠিক কথাই বলা হইয়াছে, এ জগতে এক জন কি অপর জনের মনের বেদন বুঝিতে পারে।” রাম রায়ের এই মৃদু মধুর বাক্য মহাপ্রভুর কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি রায় মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, রামরায় তুমিও এই ভাবের এক মহা কবি। চণ্ডীদাসের পদে যে এই ভাবাত্মক বাক্য আছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে আমার জানা ছিল না আমি তোমার প্রণীত শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকে প্রথমতঃ এই ভাবের

সন্ধান পাইয়াছিলাম। শ্রীরাধার উক্তিতে তোমার সেই সুবিখ্যাত শ্লোকটি আমার মনে জাগিয়া রহিয়াছে।” শ্রীরূপ অতি বিনীত ভাবে মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন, প্রভু বুঝি—

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং নচ প্রেম বা।
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ॥
অন্যোবেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং।
দ্বিত্রীণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হাহা বিধে কা গতিঃ॥

এই পদ্যটীর কথা মনে করিতেছেন?” মহাপ্রভু বলিলেন, হাঁ রূপ তাই বটে। রামরায় অতীব সুরসিক মহাপ্রেমিক কবি। শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটক খানি আকারে বৃহৎ নহে। কিন্তু ইহার প্রায় সর্ব্বত্রই উচ্চতম রসাত্মক বাক্যে পরিপূর্ণ। এই পদ্যটি তো সর্ব্বদাই আমার মনে জাগে। শ্রীরূপ, শ্রীরাধার প্রাণের দুঃখ এই যে, একের দুঃখ অন্যে জানে না। যার দুঃখ কেবল সেই জানে। রামরায় যে চণ্ডীদাসের পদটা পাঠ করিয়া এই পদ্য লিখিয়াছেন তাহা নহে। কিন্তু কবিহৃদয়ের সমতা আছে। প্রকৃত সত্য, কাব্যের শাশ্বত অংশ। উহাতে প্রকৃত কবি মাত্রেরই সমান অধিকার। আমরা মনের দুঃখ অপরকে জানাইয়া হৃদয়ের ঘন বিষাদ কিছু কমাইতে চাই কিন্তু একের দুঃখ অপরে বোঝে না। তবে একটী কথা এই যে যে, যে দুঃখ ভোগ করে, সে অপরের সেই দুঃখ কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধার যে দুঃখ, দ্বারকানাথ-বিরহে দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীদের বিরহ-দুঃখ সেরূপ তীব্র নহে। ব্রজবালাদের ন্যায় তাঁহারা মহাভাবময়ী নহেন। অতদূরের উদাহরণেই বা প্রয়োজন কি? এই গোষ্ঠের পদে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় স্নেহময়ী মা যশোদা অপেক্ষা শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম অধিকতর প্রগাঢ়, অধিকতর শক্তিশালী, সুতরাং সে বিরহও অধিকতর তীব্র। মা যশোদা

তাঁহার স্নেহের পুতুল গোপালকে কঠিন বনভূমিতে পাঠান কেন, গোষ্ঠে গমন করিতে অনুমতি দান করেন কেন—ইহা শ্রীমতী রাধার এক তীব্র দুঃখের কারণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই কথা বলিতে বলিতে নীরব হইলেন, সহসা আবার ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন।

ফলতঃ যে দুঃখ বাক্যে প্রকাশ পায় না, অন্যের নিকট বলিলেও সমদুঃখী না হইলে অন্যে তাহা বুঝিতে পারে না, সেরূপ দুঃখের কথা অন্যকে বলিয়াও কোন ফল নাই; তাদৃশ দুঃখ নীরবে নীরবে কেবলই হৃদয়টাকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে। রোদনে যে দুঃখের লাঘব হয় না, প্রলাপে যাহার প্রশমন নাই, নয়ন-জলে যাহার শান্তি নাই, সে দুঃখ অনবরতই হৃদয় ক্ষয় করে। শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকের উক্ত শ্লোকটীর পদ্যানুবাদে শ্রীলোচন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন :—

সখি হে কি কহব সে সকল দুঃখ।
আমার অন্তর হয় জর জর
বিদারিয়া যায় বুক॥
প্রেমের বেদন না জানে কখন
নিদয় নিঠুর হরি।
কুলিশ সমান তাহার পরাণ
বধিতে অবলা নারী॥
প্রেম দুরাচার না করে বিচার
স্থানাস্থান নাহি জানে।
সে শঠ লম্পট কুটিল কপট
নিশি দিশি পড়ে মনে॥
হাম কুলবতী নবীনা যুবতী
কানুর পীরিত কাল।

তাহাতে মদন হইয়া দারুণ
হৃদয়ে হানয়ে শেল ॥
আনের বেদন আনে নাহি জানে
শুনলো পরাণ সখি।
মোর মন দুঃখ তুমি নাহি দেখ
আনে জনে কাঁহা লখি ॥
কি দোষ তোমার পরাণ আমায়
সেহ মোর বশে নয়।
কানু বিরহেতে বলিলে যাইতে
তথাপি প্রাণ না যায় ॥
নারীর যৌবন দিন দুই তিন
যেন পদ্ম-পত্র-জল।
বিধি মোর বাম না হেরিল শ্যাম
আমার করম ফল ॥
সখীর সদন করি বিলপন
সজল নয়ন ধনী।
হেরিয়া লোচন আশ্বাস বচন
কহে জুড়ি দুই পাণি ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতপ্রণেতা শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি মহানুভবও শ্রীচরিতামৃতের মধ্য খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছদে মহাপ্রভুর প্রলাপ কথনে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় উহার পদ্যানুবাদ করিয়াছেন, যথা :—

উপজিল প্রেমাঙ্কুর ভাঙ্গিলে যে দুঃখ পুর
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।

বাহিরে নাগররাজ ভিতরে শঠের কাজ
পর নারী বধে সাবধান ॥
সখিহে না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈলুঁ প্রীত হলো তাহা বিপরীত
এবে যাতে না রহে পরাণ ॥
কুটীল প্রেম অগেয়ান নাহি জানে স্থানাস্থান
ভাল মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রুর শঠের প্রেম ডোরে, হাতে গলে বাঁধি মোরে
রাখিয়াছে নারী উকাশিতে ॥
যে মদন তনুহীন পরদ্রোহে পরবীণ
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার শরীরে বিন্ধি করে জরজরে
দুঃখ দেয় না লয় জীবন ॥
অন্যের যে দুঃখ মনে অন্যে তাহা নাহি জানে
সত্য এই শাস্ত্রের বিচার।
অন্য জন কাঁহা লখি না জানয়ে প্রাণ সখী
যারা কহে ধৈর্য্য ধরিবার ॥
"কৃষ্ণ কৃপা-পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার"
সখি, তোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল যেন পদ্ম-পত্র-জল
তত দিন জীবে কোন্ জন ॥
শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবের জীবন অন্ত
এই বাক্য কহনা বিচারি।

নারীর যৌবন ধন   যাতে কৃষ্ণ করে মন
সে যৌবন দিন দুই চারি ॥
অগ্নি যৈছে নিজ ধাম   দেখাইয়া অভিরাম
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়ে মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ   দেখাইয়া হরে মন
শেষে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে ॥

ইহাই মহাভাবময়ী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণানুরাগের চিত্তাকর্ষি উদাহরণ। শ্রীল চণ্ডীদাসের পদাবলীতে যে ভাবকল্পদ্রুমের বীজের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, শ্রীপাদ রামরায়ের শ্লোকে যে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল, শ্রীললোচন দাসের বঙ্গানুবাদে যাহা সরল সুন্দর সজীব সবুজ পত্রাবলীতে লোচনবিনোদিনী শ্রীমূর্ত্তিতে পাঠকগণের লোচনগোচর হইয়াছিল—ভাবগম্ভীর প্রেমিকভক্ত শ্রীপাদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের বিশ্লেষণপূর্ণ বিচার-ব্যাখ্যায় তাহা ফলে ফুলে সমাবৃত হইয়া সুবিশাল ভাব-কল্পদ্রুম-রূপে প্রেমিক ভক্ত পাঠকগণের মানস নেত্রের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে। এই শ্রেণীরই কবি গণের মধ্যে একটী সরস সুন্দর এক তানতা ও এক প্রাণতা পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের পদাবলীর অন্তরালে কাব্যের যে যমুনা-জাহ্নবী প্রবাহ দেখিয়া সাহিত্যিকগণ বিমুগ্ধ হন, বৈষ্ণব পাঠকগণের নিকট তাহা বহিরঙ্গ ব্যাপার। ইহারা উহার অন্তস্তলে প্রেম-ভক্তির সাগর-তরঙ্গের রঙ্গভঙ্গী সন্দর্শনে মধুময়ী ভক্তিময়ী উপাসনার সন্ধান প্রাপ্ত হন, এবং উহা আস্বাদন করিতে করিতে ভাবরসে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন।

পুণ্যতীর্থ সিন্ধুতটে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের কেন্দ্রমণি, প্রেমপীঠস্বরূপ নীরব নিভৃত শ্রীগম্ভীরা-মন্দির-চত্বরে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীপাদস্বরূপ দামোদর ও শ্রীপাদ রায় রামানন্দ সহ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ঠাকুর প্রভৃতির

যে পদাবলীর আস্বাদন করিতেন, সে সকল পদ প্রেমরসের অফুরন্ত প্রস্রবণ। এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ স্বরূপ ইতঃপূর্ব্বে যে দুইটি পদ গান করিয়া সপার্ষদ মহাপ্রভুর আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন, সেই পদ দুইটি এক দিকে যেন শ্রীরাধাপ্রেমের এক প্রকট মূর্ত্তি, অপর দিকে শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের অদ্ভুত কবিত্ব-প্রতিভরে সমুজ্জ্বল নিদর্শন।

"হাসিতে ঝরিছে মোতিম মাণিক
সুধাকরে কত রাশি।
হেন মনে করি আঁচল পাতিয়া
আচল ভরিয়া রাখি॥
পাছে কোন জন ডাকা চুরি দিয়া
পাছে নিয়ে যায় সখি॥

এ কাব্যের তুলনা নাই। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হাসিতে যে সকল মণি মুকুতার মোহণ প্রসার সন্দর্শন করেন, ব্রজরসবতী মহাভাবময়ী ব্রজবালিকা-শিরোমণি শ্রীরাধিকা ও উঁহার যুথস্থিতা ব্রজবালাগণ ব্যতীত তাহা অপরের লক্ষ্য নহে। শ্রীপাদ চণ্ডীদাস তাহা অনুভব করিয়াছেন সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে শ্রীপাদ চণ্ডীদাসও শ্রীরাধা-পরিকরের অন্তর্গত। এমর জগতের কবিদের পক্ষে এইরূপ অনুভব অসম্ভব। আরও শুনুন :—

এ রূপ লাবণ্য কোথাও রাখিতে
মোর পরতীত নাই।
হৃদয় বিদারি পরাণ যথায়
তথায় করেছি ঠাঞি॥

আ মরি মরি!! প্রেমের এমন দুর্ল্লভ ধনকে হৃদয়ের অন্তস্তলে নিভৃত কক্ষে গূঢ় পেটিকায় রাখাই তাদৃশী প্রেমিকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

মহাপ্রভু বলিলেন, স্বরূপ, এই পদ দুইটী অতীব মনোরম কিন্তু ইহা কিন্তু গোষ্ঠ-বর্ণনা নয়, গোষ্ঠ-গমনও নয়—শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-গমনে শ্রীরাধার বিরহই এই দুই পদে বর্ণিত হইয়াছে। গোষ্ঠ-লীলার পদ শুনিতে সাধ হইতেছে। রায় মহাশয় ও শ্রীরূপের কি ইচ্ছা ?

রায় মহাশয় বলিলেন,—তাই হউক। শ্রীপাদরূপ বলিলেন প্রভুর যাহা ইচ্ছা, তাহা নিশ্চয়ই আমাদের অশেষ কল্যাণজনক। এবিষয়ে আর আমাদের স্বতন্ত্র সাধ কিছুই নাই।

শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন—আপনারা উভয়েই যখন প্রভুর ইচ্ছানুসারে ভিন্ন ভাবের পদ গান-শ্রবণের অভিপ্রায়ে অভিমত দিলেন, তখন তদনুসারে আপনাদের প্রীতি উৎপাদনের প্রয়াস পাওয়াই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু আমার হৃদয়ে অনিবার্য্যরূপে পুর্ব্বোক্ত ভাবের আর একটি পদের ঝঙ্কার প্রবাহিত হইতেছে। উহাকে অবরুদ্ধ করিয়া পদান্তর-গানে প্রবৃত্ত হইতে হইলে হৃদয়ের আবেগে একটুকু বাধা পড়িবে। সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যেই শ্রীরাধা-প্রেমের আর একটি পদ গাইয়া গোষ্ঠ লীলার পদ শুনাইব। এই বলিয়া শ্রীপাদ পদ ধরিলেন :—

শুন শুন শুন আমার বচন
কহিছে মরম সখী।
আমি আর কভু না হও তাহার
শুনহ কমল মুখী॥
রাই বলে বড় আছে এই ভয়
পরাণ না হয় স্থির।
মনের বেদন বুঝে কোন জন
এ বুক মেলয়ে চির॥

স্বতন্তর এই গুরু পরিজন
তাহার আছয়ে ডর।
যেন বেড়া জালে সফরী সলিলে
তেমতি আমার ঘর॥
মনে হয় সাধ ত্যজি সব বাধা
হেরি ও বদন সদা।
সবার মাঝারে কুল কলঙ্কিনী
সব জন বলে রাধা॥
সে সব কলঙ্ক পরিবাদ যত
সৌরভ করিয়া নিনু।
যত যাহা বলে পাড়ার পরশী
তাতে তিলাঞ্জলি দিনু॥
চণ্ডীদাস কহে সে শ্যাম তোমার
তুমি সে তাহার প্রিয়া।
মিছাই বচন লোকের সূচনা
আমি ভাল জানি ইহা॥

গান গাইবার সময়ে মধ্যে মধ্যে স্বরূপের কণ্ঠ স্তম্ভিত হইতে ছিল। মহাপ্রভু স্বরূপের মুখের দিকে তাকাইয়া গান শুনিতে ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে কি ভাবের অবতারণা হইতেছিল বলা যায় না। গান শেষ হইলে শ্রীপাদ স্বরূপ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে মাথা রাখিয়া দুই হাতে তাহার শ্রীচরণ যুগল স্পর্শ করিয়া বলিলেন প্রভো, এ অধম সর্ব্বদাই আপনার আজ্ঞাবহ দাস কিন্তু এখন যে আজ্ঞা-পালনে অন্যথা করিয়াছি তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। ভাবের আবেগে বাধা দিতে পারিলাম না।

মহাপ্রভু অতীব গম্ভীর ভাবে বলিলেন, স্বরূপ এই মহামূল্যবান্ পদটী

না শুনিলে শ্রীরূপ, রসতত্ত্বের এই উচ্চতম তথ্য চিন্তা করার অতি অল্প সুবিধাই লাভ করিতে পারিতেন। এই পদে শ্রীমতীর হৃদয়ের মহা-গভীর ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। কানু-বিরহে তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে যে কি যাতনা হয়, তাহা অপরে বুঝিতে পারিবে না। বুকের ভিতরে যে দুঃখ অবিরত জ্বলিতেছে তাহা বুক চিরিয়া দেখাইলেও কেহ দেখিতে পাইবে না। বেড়াজালে সফরীর ন্যায় তাহাকে নানা প্রকার বাধা বিঘ্নের মধ্যে বাস করিতে হয়। ক্ষুদ্রপ্রাণ সফরী সে বেড়াজাল কাটিয়া বাহির হইতে পারে না, জালের আটকে থাকিয়া তাহাকে ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিতে হয়। শ্রীমতী এই ভাবে তাহার মনোবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। স্বরূপ, সে কি কম যাতনা? শ্রীরূপ, তোমার বিদগ্ধ মাধব নাটকের দুই একটী শ্লোকের কথাও আমার মনে হয়। এ জ্বালা যার হয় সেই বোঝে, অন্যে বুঝিতে পারে না।

যেন বেড়া জালে সফরী সলিলে
তেমতি আমার ঘর।

স্বরূপ, এই অংশ টুকু গাহিতে গিয়া যখন তোমার কণ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, তখন আমি অতি কষ্টে নয়ন জল সম্বরণ করিয়াছিলাম। শ্রীরাধা-রাণীর কৃপা না হইলে এই পদের আস্বাদ অসম্ভব।

সহস্র বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়াও শ্রীগোবিন্দের ভুবনানন্দ শ্রীমুখমণ্ডল সন্দর্শন করাই শ্রীমতীর সাধ। লোকে তাহাতেই তাঁহাকে সর্ব্বজন মধ্যে কলঙ্কিনী বলিয়া অপবাদ করে। কিন্তু তিনি আর এখন এ অপবাদে ভয় করেন না। তিনি সখীকে স্পষ্টরূপেই বলিলেন :—

সে সব কলঙ্ক পরিবাদ যত
সৌরভ করিয়া নিনু।

যত যাহা বলে পাড়ার পরশী
তাহে তিলাঞ্জলি দিনু ॥

ইহাই পরম নিষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণের জন্য নিখিল ভোগ ত্যাগ, নিখিল মান সম্মান-ত্যাগ এবং তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শন প্রাপ্তির জন্য নিরন্তর তীব্র বাসনা—ইহা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় না। ইহাই মুখ্যতম সাধন। শ্রীপাদ চণ্ডীদাস অন্যত্র বলিয়াছেন :—

তোমার কারণে কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।

এমন অকৈতব সুনির্ম্মল সমুজ্জ্বল প্রেম কেবল মহাভাববতী ব্রজবালাগণেই সম্ভবপর, অন্যত্র নহে। স্বরূপ, তুমি দয়া করিয়া এই পদটী শুনাইয়া আশাতীত আনন্দ দান করিয়াছ। শ্রীরাধা-প্রেমের মহিমা প্রকৃতই অসীম। এই জন্যই শ্রীরাসলীলা-কথায় জানা যায়, শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন "তোমাদের প্রেম ঋণ শোধ করিবার শক্তি আমার নাই।" কৃষ্ণপ্রেম-পরিবাদের কলঙ্কও যাহারা ভূষণ বলিয়া মনে করেন, সুরভি বলিয়া আদর করেন নিখিল জগতের সমস্ত স্বার্থই যাঁহাদের নিকট অতি তুচ্ছ, সেই গোপীপ্রেমের অদ্ভুত ভাব চণ্ডীদাস ঠাকুরের এই পদে কেমন সহজ সুন্দর সরল সুমধুর ভাষায় প্রকটিত হইয়াছে! স্বরূপ ধন্য তোমার অনুভব, শত ধন্য তোমার নির্ব্বাচনী শক্তি।

স্বরূপ অতীব বিনীত ভাবে বলিলেন—আর সহস্র ধন্য আপনার ঐ নিরঙ্কুশ কৃপা—এ কৃপায় তো পাত্রাপাত্র যোগাযোগ্য বিচার নাই। লোকের মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাই—

নাহি জানে স্থানাস্থান যারে তারে কৈল দান
মহাপ্রভু দাতা শিরোমণি।

এখন গোষ্ঠের একটি পদ গাইতেছি, ইহাতে আপনাকে আনন্দ দিতে পারিব কি না জানি না।" শ্রীপাদ স্বরূপ পদ ধরিলেন,—

ব্রজরাজ বাল রাজ পথে এলো
লইয়া ধেনুর পাল।
সঙ্গে সখাগণ ভাই বলরাম
ছিদাম সুদাম লাল॥
সুবল সঙ্গেতে তার কান্ধে হাত
আরোপি নাগর রায়।
হাসিতে হাসিতে সঙ্কেত বাঁশীতে
সে দুই আঁখর গায়॥
সে কথা আনেতে কিছুই না জানে
সুবল কিছু গো জানে।
হৈ হৈ করি রাজ পথে চলে
গমন করিছে বনে॥
গবাক্ষে বদন দিয়ে প্রেমময়ী
রূপ নিরীক্ষণ করে।
দোহার নয়নে নয়ন মিলল
হৃদয় হৃদয়ে ধরে॥
দেখিতে শ্রীমুখ- মণ্ডল সুন্দর
বেথিত হইল রাধা।
এহেন সন্তানে বনে পাঠাইতে
না দিল কেহ কি বাধা॥
কেমন যশোদা মায়ের পরাণ-
পুতলী ছাড়িয়া দিয়া।

কেমনে রয়েছে গৃহ মাঝে বসি
চণ্ডীদাস কহে ইহা ॥

মহাপ্রভু বলিলেন—স্বরূপ ইহাত অতি সুন্দর পদ। কিন্তু রসজ্ঞ চণ্ডীদাস ঠাকুরের হৃদয় কি প্রগাঢ় রূপে শ্রীরাধা-প্রেমনিষ্ঠ। তুমি যে পদ গাইতেছ, সকল পদেই ঐ শ্রীরাধার মর্ম্মদাহী বিরহ জনিত তাপে উষ্ণ শ্বাসের ঝড় বহিয়া যাইতেছে। ব্রজরাখালগণ গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া আনন্দ অনুভব করেন, ধেনু বৎসগণ লইয়া বৃন্দাবনের আনন্দময় ব্রজ ভূমিতে যে আনন্দ লীলা করেন সেরূপ একটি পদ শুনিতে সাধ হয়। মহাপ্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া স্বরূপ পদ ধরিলেন—

ফলে ফুলে শোভা মুনি-মনোলোভা
নব তৃণ দল তায়।
গো গোপ সহিতে এ হেন গোষ্ঠেতে
বিরাজে রসিক রায় ॥
ছিদাম সুদাম দাম বসুদাম
আনন্দ মুরতিগণ।
আনন্দ রসের গঠিত মুরতি
মহানন্দে নিমগন ॥
আনন্দের খেলা আনন্দের মেলা
আনন্দ গোবৎস লয়ে।
নিত্যানন্দময় গোবিন্দ সুন্দর
সদানন্দে মগ্ন হয়ে ॥
হাসিছে খেলিছে নাচিছে গাইছে
ধাইছে ধেনুর পাল।

হা রে রা রে করি উহাদের সনে
ছুটিছে যত রাখাল।
কখনো বা সবে মণ্ডলী করিয়া
মাঝেতে কানুকে রাখি।
নাচিছে গাইছে প্রমত্ত হইয়া
আনন্দে মগন থাকি॥
এইরূপে গোঠে শ্রীনন্দ দুলাল
নিজ সখাগণ সনে।
গোচারণ সুখে থাকে নিমগন
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু অতীব আনন্দের সহিত গানটি শ্রবণ করিয়া বলিলেন—স্বরূপ, গোষ্ঠলীলায় যে আনন্দ মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিরাজ করেন, এই পদটীতে তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীপাদ চণ্ডীদাস, লীলার মধ্যেও তত্ত্বের সমাবেশ করিয়া রাখিয়াছেন। গোষ্ঠ সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম ইহাই সম্প্রতি যথেষ্ট। শ্রীরূপ এখানে আর অধিক সময় থাকিবেন না। তোমার মুখে গীত-শ্রবণ করার সুবিধা অন্যত্র অসম্ভব। এই জন্য অন্যান্য ভাবেরও পদগান দুই চারটী ইহাকে শুনাইতে হইবে!

স্বরূপ হাসিয়া বলিলেন—দয়াময়, উহা আমার সৌভাগ্য। তোমার কৃপায় শ্রীরূপ শ্রীশ্রীব্রজরসের অসাধারণ কবি। বলা বাহুল্য যে, গানে কাব্যরস মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠে। কিন্তু আমাকে তো তুমি সেরূপ শক্তি দাও নাই। যদি সেরূপ শক্তি পাইতাম তবে কেবল গান গাইয়া এবং তোমার শ্রীচরণ দেখিয়াই এ জীবনের উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিতাম। যাহাই হউক, তুমি যে আমার গানে প্রীতি লাভ কর, রায় মহাশয়ও আমার গান শুনিয়া সুখী হন, শ্রীরূপও গান শুনিতে

আগ্রহান্বিত হইতেছেন ইহা আমি সৌভাগ্য বলিয়াই মনে করি। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠাকুরের রচিত পদাবলীতে ব্রজরসের যে এরূপ অফুরন্ত উৎস আছে, পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারি নাই। এখন তোমার কৃপায় বুঝিতে পারিয়াছি যে এই রসে প্রকৃত পক্ষে চিত্ত নিমজ্জিত হইলে উপাসনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ লীলায় রস-বৈচিত্র্যের যে অনন্ত তরঙ্গ সাগর-তরঙ্গের ন্যায় প্রেমিক ভক্তগণের মানস নেত্রের সমক্ষে বিরাজ করেন, তাহা তোমার কৃপায় এত দিনে বুঝিতে পারিয়াছি।

রসময়, এখন বিদ্যাপতি ঠাকুরের আর একটি পদ গাইতেছি, শ্রবণ করুন :—

ধনি ধনি রমণী জনম ধনি তোর।
সব জন কানু কানু করি ঝোরয়ে
সো তুয়া ভাবে বিভোর॥
চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু, লতিকা- অবলম্বন কারী
মঝু মনে লাগল ধন্দা॥

মহাপ্রভু বলিলেন অতি বিচিত্র, অতি চমৎকার! অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ভাবুক ভক্ত যোগী ও প্রেমিক সকলেই শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল। কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণ আবার শ্রীরাধার জন্য উন্মত্ত। চাতকই "দে জল দে জল" বলিয়া মেঘের নিকটে কাতর কণ্ঠে নিজের পিপাসা জ্ঞাপন করে, মেঘ কখনও চাতকের জন্য ব্যাকুল হয় না; চকোরই চন্দ্রের সুধা পানের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়, কিন্তু চন্দ্র কখনও চকোরকে খোঁজে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সকলই বিপরীত দেখিতেছি। জগদারাধ্য শ্রীকৃষ্ণ

একটি গোয়ালাবালার জন্ম একবারে উন্মত্ত। কবি এই ভাবে এই পদের সূচনা করিয়াছেন। তার পরে, স্বরূপ গাইলেন, (সখি বলিতেছেন):—

কেশ পসারি যব তুহু আছলি
উরুপর অম্বর আধা।
সে সব হেরি কানু ভেল আকুল
কহ ধনি ইথে কি সমাধা।
হসইতে কব তুহু দশন দেখাওলি
করে কর জোরহি মোর।
অলখিতে দিঠি কব হৃদয়ে পসারলি
পুন হেরি সখি করি কোর॥
এতহুঁ নিদেশ কহলুঁ তোরে সুন্দরি
জানি তুহুঁ করহ বিধান॥
হৃদয়-পুতুলি তুহুঁ সো শূন কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।

শ্রীপাদ স্বরূপ যদিও অতি গভীর ভাবে গানটী গাইতে ছিলেন কিন্তু উপসংহার-পংক্তিতে এক বারেই অধীর হইয়া পড়িলেন "হৃদয় পুতুলী তুহুঁ, সো শূন কলেবর" এই টুকু অস্ফুট হইয়া পড়িল, তাহার কণ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন, ভাল রূপে উচ্চারিত হইল না, তাঁহার নয়ন কোণ নয়ন-সলিলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মহাপ্রভু তখন নিজের হাতে মৃদুভাবে স্বরূপের মুখ চাপিয়া ধরিলেন, রায় রামানন্দ ও শ্রীপাদ রূপ বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে উহা দেখিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাপ্রভু বলিলেন—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলারসের মহিমা বর্ণনার অতীত। রামরায় তুমি তো শুনেছ,—স্বরূপ বেদান্তে মহাপণ্ডিত।

অদ্বৈতবাদীর মায়াবাদের কঠোরতায় স্বরূপের হৃদয়টীকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। জ্ঞানগুরু বিশ্বেশ্বরের রাজধানীতে বাস করিলে যে হৃদয় বিশুষ্ক হয়, কেহ কেহ যে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন; তাহাতে আমার বিশ্বাস হয় না। বিশ্বেশ্বর যে কেবল জ্ঞানেরই গুরু তাহা নহে; শ্মশানে বাস করিয়া শ্মশানের হোমানলে মানুষের অস্থিমাংস অনবরত বিদগ্ধ হইতে দেখিয়া মহাদেব দেহের নশ্বরতা ভাল রূপেই জানেন, মানুষের পার্থিব কাম যে কত জঘন্য, তাহা তাঁহার মত আর কেহই জানে না।

জগৎগুরু শিবশঙ্কর মহাত্যাগী, সুতরাং মহাপ্রেমিক। ত্যাগ ভিন্ন প্রেম হয় না। সমস্ত স্বার্থ পরিশূন্য না হইলে প্রকৃত প্রেমের অঙ্কুরই হয় না। সর্ব্বত্যাগী শ্মশানবাসী কাশীশ্বরই প্রেমের প্রকৃত মর্ম্ম জানেন, জ্ঞান তাঁহার বহিরঙ্গ ভাব। উঁহার অন্তরঙ্গ ভাব—প্রেম। স্বরূপের কাশীবাস সার্থক হইয়াছে। স্বরূপ কাশীশ্বরের কৃপায় তাঁহার খাটি প্রেমভাবে বিভাবিত হইয়াছেন। মহাকঠোর বিশুষ্ক আবরণের অন্তরালে যেমন নারিকেলের সুস্নিগ্ধ সুশীতল সুপেয় পানীয় অবস্থান করে, তেমনি শুষ্কজ্ঞানের কঠোর আবরণের অভ্যন্তরে প্রেমসুধা সঙ্গোপনে অতীব সুরক্ষিত ভাবে অবস্থান করে।

স্বরূপ এতক্ষণ নীরবে ছিলেন। মহাপ্রভুর বাক্য শেষ হওয়া মাত্রই স্বরূপ বলিলেন, কাশী ও কাশীশ্বরের মাহাত্ম্য আপনার শ্রীমুখে যাহা প্রকটিত হইল তাহা সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতেছি কিন্তু এ অধমের রস জ্ঞান—কেবল আপনারই সাক্ষাৎ কৃপা।

মহাপ্রভু শ্রীপাদ রূপকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—শ্রীরূপ, আমি তোমায় বহুবার শ্রীরাধা তত্ত্ব বলিয়াছি। তুমি নিজেও জান, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণেরই আহ্লাদিনী শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ জগতের আনন্দদায়ক। শ্রীরাধা

শ্রীকৃষ্ণেরও আনন্দদায়িনী। শক্তির অভাবে শক্তিমান্ অস্তিত্ব-বিহীন বলিয়াই প্রতিভাত হয়েন।

"হৃদয় পুতুলী তুঁহুঁ, সো শূন কলেবর" ইহা অতি সত্য কথা। সে যে কি ভীষণ শূন্যতা—যেন নিদারুণ মরুভূমি। শ্রীকৃষ্ণের নিজের উক্তি এই যে "শ্রীরাধে, প্রাণময়ী, রসময়ী প্রেমময়ী, তুমি আমার পরাণ পুতুলী—তুমি আমার নয়নের মণি, দেহের আত্মা—তোমা বিহনে এক মুহূর্ত্ত প্রাণ ধারণ করাও আমার পক্ষে অসম্ভব।" শ্রীরূপ, আমি এ সকল কথা বলিতে গিয়াও বলিতে পারি না—হৃদয় অধীর হইয়া পড়ে। এই বলিয়া প্রভু নীরব হইয়া অঝোর নয়নে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। স্বরূপ নিজের বহির্বাসে প্রভুর নয়ন-জল মুছাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু স্বরূপের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া নয়ন নিমিলিত করিয়া রহিলেন, আর সেই ভাবেও নয়নের জল ঝরঝর ঝরিয়া গণ্ড ভাসাইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল।

গম্ভীরা মন্দিরের এই নিত্যনূতন দৃশ্য স্মরণে আনিতে পারিলেও জীবের জীবন সার্থক হয়—ব্রজরসের বিন্দুমাত্র স্পর্শেও নরনারীর আত্মা অমরতা লাভ করে। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বরূপ বিদ্যাপতি ঠাকুরের আর একটি পদ ধরিলেন :—

শুনগো রাজার ঝি।
তোরে কহিতে আসিয়াছি॥
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলি কি।
বেলি অবসান কালে
গিয়াছিলে নাকি জলে
তাহারে দেখিয়া মুচকি হাসিয়া
ধরিলি সখীর গলে।

দেখায়ে বদন চান্দে
তারে ফেলিলি বিষম ফান্দে।
তুহু তরিতে আওলি লখিতে নারিল
ওই ওই করি কান্দে ॥
তাহে হৃদয় দরশি থোরি
মন করিলি চোরি
বিদ্যাপতি কহে শুনহ সুন্দরী
কানু জিয়াবে কি করি ॥

শ্রীপাদ রাম রায় বলিলেন—প্রভো, আপনি স্পষ্টতঃই বুঝাইয়াছেন শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তি ; শ্রীপাদ রূপও বহুস্থলে সেই কথার অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন হ্লাদিনীর সার,—প্রেম ; প্রেমের সার,—ভাব ; ভাবের পরমাকাষ্ঠা—মহাভাব ; শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপিণী। লীলার ব্যাপার অতি বিচিত্র। রসরাজ রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণের মধুময়ী লীলায় শ্রীরাধার মহিমা অনন্ত ও অসীম। ইহা ব্রহ্মাদিরও অনুভবনীয় নহে। শ্রীমৎ বিদ্যাপতি ঠাকুর এই পদে বিদগ্ধা-শিরোমণি শ্রীরাধার প্রেম-প্রকর্ষ চাতুর্য্য অতি পরিস্ফুট রূপেই প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাভাবময়ীর মুচকি হাসি, তড়িল্লতার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-সমক্ষে আত্ম প্রদর্শন মাত্রই অন্তর্ধান—এই উভয় ব্যাপারের ফল শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে নিদারুণ হইয়া উঠিল। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

দেখায়ে বদন চান্দে
তাকে ফেলিলি বিষম ফাঁদে ;
তুহু তরিতে আইলি লখিতে নারিল
অই অই করি কান্দে।

প্রেম-জগতের ইহা এক গভীর রসতত্ত্ব। ঠাকুর বিদ্যাপতি এইরূপ অন্য একটি পদ লিখিয়াছেন উহা এই :—

যব গোধুলি সময় বেলি
ধনী মন্দির বাহির হলি
নব জলধর বিজুরি রেহা
দ্বন্দ্ব পাসরি গেলি।

ধনী অলপ বয়সী বালা
জনু গাঁথনি পুহপ মালা
থোরি দরশনে আশ না মিটল
বাড়িল মদন জ্বালা॥

গোরি কলেবর নুনা
জনু আঁচরে উজোর সোনা
কেশরী জিনিয়া মাঝারি খিনি
দুলহ লোচন কোণা।

ঈষৎ হাসিলি সনে
মুঝে হানল নয়ন বাণে
চিরজীবী রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভণে॥

প্রেমিক প্রেমিকার উভয়ের অনন্তকাল সন্দর্শনে বা অনন্তকাল আলাপেও তৃপ্তি নাই—মহাভাবলক্ষণে কল্পকালও নিমেষের মত প্রতিভাত হয়—ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার উপরে যখন তড়িৎ প্রভার ন্যায় উভয়ের দেখা হওয়ার আশা থাকে না, তখন উহার ফল অতীব মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠে।

বিদ্যাপতি ঠাকুর বিরচিত এইরূপ আরও একটি সুপ্রসিদ্ধ পদ আছে তাহা এই :—

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল ;
মেঘমালা সঞে তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল।
আধ আঁচরে হাসি আধ বদনে হাসি
আধহি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তব ধরি দগধে অনঙ্গ ॥
একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাচলা উপাম।
হার হরি লব মন জনু বুঝি ঐ ছন
ফাঁস পসারল কাম ॥
দশন মুকুতা পাতি অধরু মিলায়ত
মৃদু মদু কহ তহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুঃখ রহ
হেরি হেরি না পূরল আশা ॥

অনন্ত কল্পেও এ আশার তৃপ্তি নাই। প্রেমের এই অফুরন্ত পিপাসা আরও বহুল পদে এইরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু বলিলেন, রামরায় এক্ষণে আরও একটি পদ স্মরণ কর—

জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ান না গেল ॥

রামরায় বলিলেন—প্রভো প্রেমের অবিতৃপ্ততা সম্বন্ধে ইহা প্রগাঢ় সত্য। রাবণের চিতার ন্যায় এ আশার অনল ও বিরহের অনল চিরদিনই অবিরাম অবিশ্রান্ত ভাবে জ্বলে। কখনও ইহার তৃপ্তি বা শান্তি নাই। এইরূপ প্রেম অনুদিনই প্রবর্দ্ধিত হয়—কখনও ইহার হ্রাস হয় না।

গম্ভীরা মন্দিরে এইরূপে শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী আস্বাদিত হইত। এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে শ্রীমৎ বিদ্যাপতি ঠাকুর ও চণ্ডীদাস ঠাকুরের পদাবলী যে রূপ ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে, মূলে সে ভাষা ছিল কি না বিচার্য্য। চণ্ডীদাস বাঙ্গালী কবি। তাঁহার নিবাস বীরভূম গ্রামে। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বীরভূম নান্নুর অঞ্চলে যে ভাষা প্রচলিত ছিল তাহা ঠিক এরূপ নয়। চণ্ডীদাসের নামে যে সকল পদাবলী আমরা দেখিতে পাই, সে ভাষা আধুনিক প্রচলিত সরল বাঙ্গালা ভাষা উহাতে বীরভূমের বিশিষ্টতা নাই। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন নামে যে গ্রন্থখানি বাঙ্গলা সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, উহার সম্পাদক ঐ গ্রন্থ খানিতে প্রকাশিত পদাবলীকেই চণ্ডীদাসের খাটি পদাবলী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থে যে সকল পদাবলী দৃষ্ট হয় সে ভাষা, প্রাচীনতার প্রমাণ দেয় বটে কিন্তু ঐ সকল পদের সহিত প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর কোনও ঐক্য নাই; অপিচ ঐ সকল পদে প্রচলিত পদাবলীর ন্যায় সরল সুন্দর সর্ব্বচিত্তাকর্ষী ভাবের উচ্চতাও পরিলক্ষিত হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলার যে সকল ভাবরসে নিমগ্ন থাকিতেন, তাহা প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেই দৃষ্ট হয়। অপরন্তু মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের কোন কোন পদ এক বারেই আধুনিক বাঙ্গালায় বিরচিত। এই পদগুলিতে বিদ্যাপতি ঠাকুরের ভাষার পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহারা খাটি মৈথিল ভাষার পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন সেই সংগৃহীত পদাবলীতেও এই সকল পদের মৌলিক

কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে এমন একটা সন্দেহ সহজেই মনে উদিত হয়, যে আধুনিক পদকর্ত্তাদের মধ্যে হয় তো কোন কবি বিদ্যাপতির নাম দিয়া নিজেই এই সকল পদ রচনা করিয়াছেন।

কিন্তু এই ধারণাও ঠিক বলিয়া বলা যায় না। এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে বহুবার বহুত্র আলোচিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে—বিশেষতঃ গ্রন্থের এই রূপ স্থলে উহা একেবারেই আলোচ্য নহে। তথাপি পাঠকগণের হৃদয়ে একটু অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক করার জন্ম এই কয়েকটা কথার অবতারণা করা হইল। হিতবাদী কার্য্যালয়ে প্রকাশিত বিদ্যাপতি গ্রন্থ হইতে নিম্ন লিখিত পদটীতে মৈথিলী ভাষার অতি অল্প পরিচয়ই দৃষ্ট হয়, ইহা খাটি বাঙ্গলা।

মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানুহেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব॥
তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণ কালে কৃষ্ণ নাম লিখো মঝু অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কাণে।
মড়া দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণ নাম শুনে॥
না পোড়াইও রাধাঅঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালেরি ডালে।
সেই তো তমাল তরু কৃষ্ণ বর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়॥
কবহুঁ সে পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পাওব হাম পিয়া দরশনে॥
পুন যদি চাঁদ মুখ দেখিতে না পাব।
বিরহ অনলে হাম তনু তেয়াগিব॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলিবে মুরারি ॥

এই পদটি ভাবে ও ভাষায় সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। এস্থলে উভয় কবির ভাষার সম্বন্ধে কোনও আলোচনা না করিয়া আমরা প্রচলিত চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদের রসাস্বাদে গম্ভীরা-রীতি-অনুসারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়ের পদাবলীর গান শ্রবণ করিতেন। এই উভয়ের পদাবলীর মধ্যে কাহার পদে তাঁহার চিত্ত অধিকতর আকৃষ্ট হইত, কেহ কেহ আমাকে এইরূপ প্রশ্ন করেন। সদাশয় পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারেন যে এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ভাবনিধি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সিদ্ধ কবিগণের ভাব-তারতম্য বিচার করিতেন কিনা, তাহা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাশয়ের ধারণাতেই আসিতে পারে না। সুতরাং এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা আমার মনে এইরূপ প্রশ্নের উদয়ই হয় না। তবে আমার নিজের কথা, বলিতে পারি। পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ঠাকুরের যে সকল পদাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমার মনে এই ধারণা হইয়াছে যে চণ্ডীদাস অধিকতর ভাবময়। আমি শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ঠাকুরের পদাবলীতেই অধিকতর আকৃষ্ট। তাঁহার পদাবলীর ভাবে আমার চিত্ত অধিকতর ব্যাকুল হয়। সম্ভবতঃ শ্রীপাদ বিদ্যাপতি ঠাকুরের কাব্যসৌন্দর্য্যে প্রবেশ করার উপযোগী ততটা অধিকার আমি লাভ করিতে পারি নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহার অনেক পদেই আমার চিত্ত বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। আমি কেবল তুলনায় সমালোচনার কথাই বলিতেছি। ভক্ত পাঠকগণ যেন এমন মনে না করেন যে ঠাকুর বিদ্যা-পতির কাব্য প্রকৃত পক্ষে চণ্ডীদাস ঠাকুরের পদাবলীর তুলনায় কোন অংশে ন্যূন। আমি কেবল আমার অযোগ্য চিত্তের অসম্যক্ ধারণার

কথাই সরল হৃদয়ে এখানে প্রকাশ করিলাম। শ্রীপাদ জয়দেবের ন্যায় এই উভয় কবিই ব্রজরসের মহাকবি। তথাপি চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আমার চিত্ত অধিকতর বিমুগ্ধ হয় ভক্ত প্রবর শ্রীরামদাস মহাত্মা যেমন বলিয়াছিলেন—

শ্রীনাথে জানকী-নাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥

"শ্রীনাথ ও জানকীনাথ তত্ত্বতঃ এক, তাহাতে সন্দেহ নাই তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব।" এস্থলেও ঠিক সেইরূপ।

এখন শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের কতিপয় পদাস্বাদনের চেষ্টা করা যাইতেছে। লীলারসের কোনও ক্রম-অনুসারে এই স্থলে কোনও আলোচনা করা হইল না। পদাবলী পড়িতে পড়িতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় যখন যে পদটীতে চিত্তাকৃষ্ট হইল, তাহাই লিখিত হইল।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলামৃতের মধ্যে দান-লীলাটীও অতি রসময়ী। শ্রীকৃষ্ণ, নন্দরাজের পুত্র হইলেও ধেনুবৎসচারণ তাঁহার বর্ণধর্ম্ম। তিনি রাজপুত্র হইলেও বর্ণধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ গোঠে মাঠে রাখালবেশে ধেনুবৎস চারণ করেন। শ্রীরাধা, বৃষভানু রাজনন্দিনী হইলেও বিবিধ গব্যদ্রব্যর পসরা লইয়া বিক্রয়ার্থ ঘরের বাহির হন। এই সকল দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতাদের নিকট হইতে রাজকর আদায় করা হয়। এই বিষয়ে কোন নরনারী বিক্রেতারই অব্যাহতি নাই। ব্রজবালিকাদের এই ব্যবসায়ে কর-আদায়ের কার্য্যটা কেবল রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণকেই সম্পন্ন করিতে দেখা যায়। যিনি এই রাজস্ব আদায় করেন, তাহার নাম দানী। এই রাজস্ব আদায় কার্য্যে, মহাজনী পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের অনেক রসময় ধূর্ত্ততা ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামি মহোদয় এই বিষয় বর্ণনা করিয়া দানকেলিকৌমুদী নামে একখানি ভাণিকা রচনা

করিয়াছেন। নাটকীয় সাহিত্যে ভাণিকা নামে এক শ্রেণীর নাটক দৃষ্ট হয়। সাহিত্যদর্পণকার বলেন "ভাণং স্যাৎধূর্ত্তচরিতম্" ভাণে বা ভাণিকায় ধূর্ত্তচরিত বর্ণিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ সকল বিষয়েই পূর্ণ-পূর্ণ নায়ক। ধূর্ত্ততা সম্বন্ধেও তিনি ধূর্ত্তশিরোমণি। ইহার হাতে পড়িয়া সরলা ব্রজবালাদের লাঞ্ছনাবিড়ম্বনার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীপাদ চণ্ডীদাস সেরূপ বর্ণনার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। এই কঠোর কার্য্যভার লইয়াও তাঁহার চিত্তের অসাধারণ কোমলতা শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের পদে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। শ্রীরাধাকে গব্যবিক্রয়ার্থ আনিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

সোণার বরণখানি মলিন হয়েছ তুমি
হেলিয়ে পড়েছ যেন লতা।
অধর বান্ধুলী তোর নয়ান চাতক ওর
মলিন হইল তার পাতা॥
বরণ বসন তায় ঘামে ভিজে একঠায়
চরণ চলিতে নার পথে।
উতাপিত রেণু তায় কত না পুড়িছে পায়
পশরা বাজিল তার মাথে॥
রাখগো পশরাখানি নিকটে বৈঠহ তুমি
শীতল চামরে করি বা।
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনুখানি
মুখে না নিঃসরে এক বা॥
বসিয়া রসিক রায় বলয়ে বুঝিয়া তায়
হাসি রাধা বলিছে বড়ায়ে।

চণ্ডীদাস শুনি দেখি শুনহে কমলমুখি
বৈস ক্ষেণে কদম্বের ছায়ে॥

ফাল্গুনের শেষে সিন্ধুতটস্থিত উপবনে স্নিগ্ধচ্ছায় অশ্বত্থ মূলে সহচরসঙ্গ মহাপ্রভু উপবিষ্ট ছিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ সময় বুঝিয়া এই গানটী গাইতে লাগিলেন। গান শেষ হইলে রামরায় বলিলেন রসময় রসিকশেখরের এমন কোমল করুণ আদরের—সোহাগের ও স্নেহের ভাষা শুনিয়া আমার মনে হইতেছে যদি আর জন্মে যাবটে আহিরী-গোয়ালাদের ঘরে মেয়ে হইয়া জন্মিতে পারিতাম, আর কালিন্দীতটবর্ত্তী উপবনের নিকটে শ্রীমতী রাধার নিকটে বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ কথা শুনিতে পাইতাম তবে বিনামূল্যে তাঁহার চরণে দাসীভাবে এ তনু বিকাইয়া দিতাম!

রায় মহাশয়ের এই অভিলাষের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—কখনও কি তা হয় নাই, এইকি নূতন অভিলাষ? পুরাতনকে নূতন করিয়া দেখা—নূতন করিয়া মনে করা নবরাগে তৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করা—অনুরাগেরই নিত্য লক্ষণ। দেহান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতিরও একটা আভাস হয়। রাম রায়, ইহা তো তোমার নিকট নূতন নয়!

স্বরূপ বলিলেনএই পদটি যে রায় মহাশয়ের চিত্ত বিনোদন করিয়াছে, ইহাতে আমার আনন্দ হইতেছে। আজ হঠাৎ এই পদটি আমার মনে পড়িল। শ্রীরূপ অতীব বিনীতভাবে কর জুড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন শ্রীপাদ, এই ধরণের আরও একটি পদ শুনিতে ইচ্ছা হয়। মহাপ্রভুর আদেশ এবং আপনাদের কৃপা হইলে"—এই কথার শেষ হইতে না হইতেই মহাপ্রভু বলিলেন, তথাস্তু।

তখন তৎক্ষণাৎ স্বরূপ গাইতে লাগিলেন:—

এস ধনি রাধা তুমি তনু আধা
অনন্ত ভাবিয়ে ভাবে।

ভব বিরিঞ্চি তারা নিরন্তর
যে পদ পল্লব লবে ॥
শুক সনাতন পরম কারণ
ও পদ পঙ্কজ আশ।
ব্রজপুরে হেথা হয়ে গুল্ম লতা
ইহাতে করিয়ে বাস ॥
হইয়ে দেবতা হবে তরু লতা
কিসের কারণে হেন।
ওপদ-পঙ্কজ রেণুর লাগিয়ে
তাঁহাদের ধায় মন ॥
ধেয়ানে না পায় যাহার চরণ
সে জনা দানের ছলে।
আজ শুভদিনে পাইনু দর্শন
তোমারে পেয়েছি কোড়ে ॥
তুমি সে পরম আমার মরম
তোমারে ভাবিগো সদা।
হৃদয় ভিতরে ভাবি গো তোমারে
আছি যে সদাই বাঁধা ॥
কত ছলা কলা তোমার কারণে
দানের আরতি তাই।
চণ্ডীদাস বলে ঐছন পিরীতি
খুঁজিয়া পাইবে নাই ॥

মহাপ্রভু বলিলেন, ইহা অতি ঠিক কথা; কি বল, রায় রায়? শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মার স্তবে স্পষ্টতঃই এই কথা জানা

যায়। ব্রজগোপীর চরণরেণু লাভের জন্য স্বয়ং ব্রহ্মাও ব্রজের লতাগুল্ম হইতে সাধ করিয়া ছিলেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবেরও উহাই আন্তরিক প্রার্থনা ছিল। প্রেম সাধনার মহা পীঠস্থলী ব্রজের ব্রজবালাদের চরণরেণু—সেই ব্রজরেণু—ব্রহ্মাদিরও সুদুর্লভ। ব্রহ্মার আন্তরিক প্রার্থনা এই যে :—

তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্ গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ
স্তদ্যাপি যৎ পদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥

ব্রজের বনে গুল্ম-জীবন
সফল করি মানি।
গোপীর চরণ ধূলি কণা
খাঁটি পরশ মণি॥
সে কণার পরশ পেলে
জীবন ধন্য হয়।
সে ধূলা পরশে শ্রুতি
সাধনাতে রয়॥
গোপীর প্রাণ গোপীর আত্মা
গোবিন্দ সুন্দর।
গোপীর পদরেণু লাগি
ব্রহ্মা মাগেন বর॥
ধূলি নয় ধূলা নয় গোপীর পদরেণু।
শিরে ধরি ধন্য হন নন্দের বেটা কানু॥

গোপীহৃদয়—অকৈতব কৃষ্ণ প্রেমের আশ্রয়। যে হৃদয়ে রাধবের

চিতার ন্যায় দিবানিশি কৃষ্ণবিরহানল জ্বলিতে থাকে, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শনেও যে অনলের নিবৃত্তি নাই—স্বরূপ, যে গোপীদের শ্রীচরণ ধুলির জন্য ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবও ব্যাকুল হইতেন, সেই গোপীদের কথা মনে হইলেই আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে।

স্বরূপ বলিলেন প্রভো, তবে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে আরও একটি পদ শুনুন :—

আন জন যত বলে,—
সে সব সৌরভ এ চুয়া চন্দন
করিয়া লয়েছি হেলে ॥
তুমি মোর ধনি নয়ন রঞ্জন
দুটী সে আঁখির আঁখি।
তিল আধ কাল তোমারে না দেখি
মরমে মরিয়া থাকি ॥
শয়নে ভোজনে নয়নে নয়নে
আঁখির অগোচর যবে।
তখন যে মিছা জীবহ জীবনে
পরাণ না রহে তবে ॥
তেজি আন পথ গোপত আরতি
সকলি তোমার পায়।
নিরন্তর মনে সঘন সঘন
তুয়া পথ পানে চায় ॥
গোলক বিহার পরিহরি রাধে
গোকুলে গোপের ঘরে।

তুয়া আপবাস পরশ লাগিয়া
আসিনু তোমার তরে ॥
তোমা হেন নিধি মোরে দিল বিধি
শুনহ কিশোরী গৌরী।
চণ্ডীদাস কয় হেন মনে লয়
নয়ন আড় না করি ॥

এই ভাবের আরও একটি পদ গাইতেছি :—

তুমি সে আঁখির তারা।
আঁখির নিমিখে কত শত বার
নিমিখে হইয়ে হারা ॥
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
পাইনু কদম্ব মূলে।
বৈস বৈস রাধা কত না বাজিছে
ওরাঙ্গা চরণ তলে ॥
শিরীষ শরীর ছটায় রবির
মলিন হয়েছে মুখ।
আহা মরি মরি বিষম গমনে
কত না পেয়েছ দুখ ॥"
আপনার পীত বসন অঞ্চলে
রাই মুখ মুছে শ্যাম।
বসন বাতাসে শ্রম দূর করে
মিটিল অঙ্গের ঘাম।
নীপ কদম্ব তরুয়ার তলে
সহচরী গোপীগণে।

রস-সরসিজ সরস বচনে
চাহিয়ে শ্যামের পানে ॥
রসিয়া বড়াই কহিছেন তহি
শুনহ রমণী যত।
প্রেমরস দান কর সমাধান
তাহা না বুঝয়ে কত ॥
ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে কহে এক ভিতে
সেই সে চতুর বুড়ি।
উকি দিয়া চাহে আন পথে রহে
পড়িল হাতের বারি ॥
কানু করে লই ছানা দুধ দই
বদনে ঢালিয়া দেয়।
কার বা বসন লইল যতনে
কারো বা হারটি লয় ॥
ঐছন কি রীতি ধরিয়া পিরীতি
ধরিয়া রাধার করে।
স্নিগ্ধ তরুবর কদম্বের তলে
বৈঠল নাগর বরে ॥
চণ্ডীদাস দেখি দুহু রূপখানি
মনেতে লাগিল ভাল।
একুল ওকুল যমুনা কিনারা
সকলি করিল আলো ॥

গান শেষ করিয়া স্বরূপ বলিলেন, প্রভো এবার দান-লীলার মিলন শেষ করিলাম। শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ঠাকুর সিদ্ধ কবি। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের

কৃপায় তিনি স্ফূর্ত্তিতে লীলা দর্শন করেন, বাক্যালাপ শ্রবণ করেন—ইহা আপনার শ্রীমুখেই শ্রবণ করিয়াছি। লোক পরম্পরায় তদীয় পদাবলী শ্রবণের অধিকারও তোমার কৃপাতেই পাইয়াছি। তোমার দেওয়া ধন তোমার নিকটে সমর্পণ করিয়াই আমি সুখী। শ্রীদেবায় মহাশয় তো আমাদের নিত্য সঙ্গী। সৌভাগ্য এই যে এবার আপনার প্রিয় কবি শ্রীলরূপ গোস্বামিমহোদয় এখানেও সমাগত। এই শুভ সমাগমে শ্রীভগবানের মধুময় লীলাগানে আপনাদের হৃদয়ে যদি কিঞ্চিৎমাত্রও আনন্দ দিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তবে এ ক্ষুদ্র জীবন নিশ্চয়ই সার্থক হইল। এই বলিয়া স্বরূপ নীরব হইলেন।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামিমহোদয় অতি দীন ভাবে করযোড় পূর্ব্বক মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—শ্রীগম্ভীরামন্দির—প্রেমরসের মহাপীঠ স্থান। ব্রজের মধুর লীলা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমানা—কিন্তু এখানে এক বারেই মূর্ত্তিমতী। আপনার গানে আমার ন্যায় জীবাধমের হৃদয়েও উহা পূর্ণ মাধুর্য্যে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছেন। আপনাদের শক্তিসামর্থ্য বুঝিয়া উঠা ব্রহ্মাদির পক্ষেও সহজ নহে—আমি তো অতি তুচ্ছ জীব। প্রভুর আদেশে আমাকে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে হইবে বটে কিন্তু সেখানে প্রত্যক্ষ ছাড়িয়া ধ্যানে লীলা দর্শনের প্রয়াস পাইতে হইবে। প্রভুর শক্তি ভিন্ন সেখানে ধ্যানেও স্ফূর্ত্তি আসিবে না। যখন আপনার শ্রীমুখে লীলা-গান শ্রবণ করি তখন মনে হয় যেন সাক্ষাৎসম্বন্ধেই শ্রীলীলা দর্শন করিতেছি। প্রভুর শ্রীমুখপঙ্কজের দিকে দৃষ্টি করিলে মনে হয়, তদ্ভাব-বিভাবিতা শ্রীশ্রীরাধারাণী যেন প্রত্যক্ষ দর্শন দিতেছেন। শ্রীগম্ভীরামন্দিরের এই ভরপুর আনন্দ ছাড়িয়া গোলোকগোকুলে বাসেও ইচ্ছা যায় না। একথা বলিতে গিয়া যদি কোন অপরাধ হয়, সে অপরাধও প্রকৃত সত্যের জন্য স্বীকার করিয়া লইতেছি। শ্রীপাদঠাকুর মহাশয়, আপনার গানের কি ঐন্দ্রজালিক

শক্তি! তাহা না হইলে কি আমার ন্যায় পাষাণ হৃদয়েও লীলারসসিন্ধুর এরূপ প্রবল তরঙ্গাভিঘাত অনুভূত হয়?

শ্রীরামরায় বলিলেন—শ্রীরূপ, আপনি মহানুভব। স্বয়ং মহাপ্রভু আপনাতে শক্তিসঞ্চার করিয়া ব্রজরসের মহাকবিত্বে আপনাকে প্রতিভাবিত করিয়াছেন। আমি তো কতিপয় বৎসর শ্রীচরণ তলে পড়িয়া রহিয়াছি। কিন্তু আপনার ন্যায় অনুভব-লাভে আমার অধিকার হয় নাই। শ্রীবিদগ্ধমাধব ও শ্রীললিতমাধব নাটক দুই খানিতে আপনিও তো সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের রসময়ী লীলা দর্শনের অকাট্য নিদর্শন দিয়া রাখিয়াছেন। সাক্ষাৎ দর্শন না পাইলে কি এমন ভাবে লীলা-বর্ণনা করা যায়? ইহা মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপা! এ অধমের প্রতিও প্রভুর কৃপা আছে, তাহা সাক্ষাৎ নহে—গৌণী।

শ্রীরূপ কর্ণে হাত দিয়া জিভ্ কাটিয়া বলিলেন একথা বলিতে নাই—আমি শত অপরাধে অপরাধী; আমায় আরও অধিকতর অপরাধী করিবেন না।

শ্রীপাদ স্বরূপ হাসিয়া বলিলেন, কাহাকেও অপরাধী হইতে হইবে না, এই দেখুন আমি নিজেই স্বেচ্ছাকৃত অপরাধে অপরাধী হইতেছি। ব্রজলীলা অতি নিগূঢ়। ইহার উপরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মধুময়ী লীলা একবারেই নিগূঢ় তত্ত্বময়ী। আমি সেই লীলা, গানে ব্যক্ত করিতে সাহসী হইতেছি। আমার ন্যায় অপরাধী আর কে আছে বলুন দেখি!" এই বলিয়া গান ধরিলেন :—

বঁধু যদি গেল বনে শুন ওগো সখি।
চূড়া বেঁধে যাব বনে যথা কমল আঁখি॥
বিপিনে ভেটিব যেয়ে শ্যাম জলধরে।
রাখালের বেশে আর হরিব অন্তরে॥

চূড়াটি বাঁধহ শিরে যত সখীগণ।
পীতধরা বাঁধ সবে আনন্দিত মন॥
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনী।
নয়নে হেরিবে সেই শ্যাম গুণমণি॥

গান শুনিয়া মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন—বিচিত্র ব্যাপার, অতি উত্তম। তার পর, স্বরূপ, তার পর?

স্বরূপ তখনই পদ ধরিলেন—

যোগমায়া পৌর্ণমাসী সাক্ষাতে আসিয়া।
লইল হরের শিঙ্গা আপনি মাগিয়া॥
সাজল রাখাল বেশে রাধা বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম, কানাই আপনি॥
*   *   *   *
আনন্দিত হয়ে সবে পো'রে শিঙ্গা বেণু।
পাতাল হইতে উঠে এক লক্ষ ধেনু॥
চৌদিকে ধেনুর পাল হাম্বা হাম্বা রবে।
তা দেখিয়া আনন্দিত সবাই অন্তরে॥
ইন্দ্র আইল ঐরাবতে দেখয়ে নয়নে॥
হংস বাহনে ব্রহ্মা আনন্দিত মনে॥
বৃষভ বাহনে শিব বলে ভালি ভালি।
মুখে বাদ্য করে, নাচে দিয়া করতালি॥
চণ্ডীদাসের মনে আন নাহি ভায়।
দেখিয়া সবাররূপ নয়ন জুড়ায়॥

মহাপ্রভু বলিলেন, স্বরূপ এ অতি চমৎকার লীলা। আরও বলিবার বিষয় এই যে শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের লীলাদর্শনতো লীলাশক্তিরই কৃপা। শ্রীমতী

বাশুলী দেবীই এই লীলা-শক্তি। যদিও এই দর্শন-ব্যাপারটী ভগবৎশক্তির সাহায্যেই সম্পন্ন, কিন্তু ইহাতে শাস্ত্রসিদ্ধান্তেরও অভাব দৃষ্ট হয় না। গোপী গোষ্ঠে ধেনু বৎসের প্রয়োজন। শ্রীপাদ চণ্ডীদাস এই ব্যাপার-সম্পাদনের জন্য তৎক্ষণাৎ যোগমায়াদেবীর উল্লেখ করিলেন। তিনি ভিন্ন এ অঘটন-ঘটন আর কিরূপে সম্ভবপর হইবে? তাই অচিন্ত্যতর্কৈশ্বর্য্য শক্তিময়ী যোগমায়া দেবীর প্রভাবে লক্ষ লক্ষ ধেনু বৎস তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল। গোপীগণ হারে রে রে রব তুলিয়া শিঙ্গা বেনু বাজাইয়া রাখাল বেশে রাখাল-রাজের গোষ্ঠে গমনের উদ্যোগ করিলেন। সাজ সজ্জাটী কিরূপ হইল, স্বরূপ?

স্বরূপ হাসিয়া বলিলেন—তাও শুনুন :—

গায় রাঙ্গা মাটি কটি তটে ধটী
মাথায় শোভিত চূড়া।
চরণে নূপুর বাজে সবাকার
গুঞ্জমালা গলে বেড়া।
সবাকার কুচ হইয়াছে উচ
এ বড় বিষম জ্বালা।
কমলের ফুল গাঁথি শত দল
সবাই গাঁথিল মালা॥
ধীরে ধীরে চূড়া গলে দিল মালা
নামিয়ে পড়েছে বুকে।
ফুলের চাপনে বুক ঢাকা গেল
চলিল পরম সুখে॥
পড়ি পীত ধটী হাতে লয়ে লাঠি
হারে রে রে করি ধায়।

চণ্ডীদাস ভণে গহন কাননে
শ্যাম ভেটিবারে যায়॥

স্বরূপের গান শুনিয়া গম্ভীরা-মন্দিরে হাসির একটা রোল পড়িয়া গেল। রায় রায় বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন, প্রভো এ বড় বিস্ময়ের বিষয় বটে!

প্রভু বলিলেন, এতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? যাহাদের চাতুর্য্যের প্রতিভা-গৌরবে স্বয়ং শ্রীগোবিন্দ পরাজিত হন, তাঁহাদের কি প্রতিভার ও চাতুর্য্যের সীমা আছে? ইহার উপরে ভগবৎ-শক্তি স্বভাবতঃই অচিন্ত্যতর্কৈশ্বর্য্যশালী। ইহাতেই রসের চমৎকারিত্ব সাধিত হয়। গোষ্ঠে শ্রীরাধা একাকিনী সুবলের বেশ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা হইয়া ছিলেন। তাহা সুবল মিলন নামে অভিহিত। উহাতে প্রচুর কবিত্ব ও চমৎকারিত্ব দৃষ্ট হয়। কিন্তু চণ্ডীদাস এস্থলে গোপী গোষ্ঠের বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপরের ঘটনা শুনুন:—

যমুনার তীরে সবে যায় নানা রঙ্গে।
শাঙলি ধবলি বলি আনন্দিত অঙ্গে॥
আসিয়া নিভৃত কুঞ্জে সবে দাঁড়াইল।
রাখাল দেখিয়া শ্যাম চমকি উঠিল॥
কোন্ গ্রামে বসতিরে কোন গ্রামে ঘর।
আমার কুঞ্জেতে কেন হরিষ অন্তর॥
কাহার নন্দন তোরা সত্য করি বল।
মুখে হেসে বাক্য কহে অন্তরে বিভল॥
রাধা অঙ্গের গন্ধে কৃষ্ণের নাসিকা মাতায়।
আপাদ মস্তক কৃষ্ণ ঘন ঘন চায়॥

ললিতা হাসিয়া বলে শুন "শ্যামধন।
রাধারে না চেন তুমি রসিক কেমন॥
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধাবিনোদিনী।
হের গো শ্যামের রূপ জুড়াবে পরাণী॥

সুবল মিলনের পালায় আরও বৈচিত্র্য আছে। শ্রীকৃষ্ণ সুবলবেশ-ধারিণী শ্রীমতী রাধিকাকে কোনও প্রকার চিনিতে পারেন নাই। সুবলের রূপ ও শ্রীরাধার রূপ প্রায় একরূপ ছিল। শ্রীলীলাশক্তি দ্বারা সে সাদৃশ্য আরও বিপুল হইয়া ছিল। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহ মিলনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। প্রেমের সেই ব্যাকুলতায় বিচার-বুদ্ধি বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল। সুবল-বেশা শ্রীরাধা বলিলেন, সখে শ্রীরাধা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা। তাঁহাকে ঘরের বাহির করা এখন কিছুতেই সম্ভবপর নহে। তোমার অভিপ্রায় হইলে চন্দ্রাবলীকে আনিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন—সখে, জলের পিপাসা ঘোলে মিটিবে না। শ্রীরাধার অদর্শনে এ প্রাণ ধারণ অসাধ্য। এই ধর আমার চূড়া বাঁশী; ইহা শ্রীরাধার চরণে দিয়া বলিও তোমার অদর্শনে তোমার প্রেম-ভিখারী শ্রীকৃষ্ণ তোমার রূপ চিন্তা করিয়া তোমার নাম করিতে করিতে শ্রীরাধা-কুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—এই বলিয়া তিনি যখন সবেগে শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, শ্রীরাধা তখন কোলের বাছুরি ভূমিতে রাখিয়া নিজের প্রাণবল্লভকে আপন বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। সুবল-মিলনের এই উপসংহার অতীব মধুময়।

পুরীধামে বসন্তকালের প্রভাব স্বভাবতঃই অতি মনোরম। এক দিবস শ্রীপাদ স্বরূপ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই গম্ভীরা-মন্দিরে আগমন করিলেন, দেখিলেন প্রভুর মুখখানি প্রফুল্ল। প্রভু বলিলেন, স্বরূপ আমি তোমার আগমনের জন্যই প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম। গত রাত্রিটা একরূপ

আনন্দেই ছিলাম। এখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সে অনুভব নাই, কিন্তু স্মৃতিটি স্ফূর্ত্তির ন্যায় মনে আনন্দ দিতেছে।

স্বরূপ বলিলেন, প্রভো আপনার মনোগত ভাব পশ্চাতে ব্যক্ত করিবেন; এখন আমি যে ভাবটি লয়ে এসেছি, তাহাই জানাইতেছি, আমার প্রতি আপনার কৃপা-মহিমার কি অদ্ভুত শক্তি, ইহাতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। রসময় কবি চণ্ডীদাস ব্রজরসের সিদ্ধ কবি। গত রাত্রি শেষে তাঁহার কয়েকটি পদ এমন আবেগে আমার স্মৃতিপটে উদিত হইয়াছিল যে তখনই ছুটিয়া আসিয়া আপনাকে সেই কয়েকটী পদ শুনাইতে প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। তাই মনের উদ্বেগে নিশি শেষ হইতে না হইতেই ছুটে এসেছি। একটি একটি করিয়া শুনাইতেছি। শ্রীকৃষ্ণভাবিনী শ্রীরাধা দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমের ভাবনা করেন। শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎপ্রাপ্তি তাঁহার পক্ষে অতীব দুর্লভ। ধ্যান ও ধ্যানে স্ফূর্ত্তি ও স্ফূর্ত্তিতে মিলন-সুখ-সম্ভোগে স্বপ্নের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের উদয় হয়, সে স্ফূর্ত্তির অন্তে লজ্জা বিষাদ ও আনন্দ যুগপৎ তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়া কিলকিঞ্চিত ভাবের সৃষ্টি করে। শ্রীমতী তাঁহার সখীর নিকট এক অদ্ভুত রজনী-বিলাসের কথা বলিতেছেন :—

আজুক শয়নে ননদিনী সনে
শুতিয়া আছিনু সই।
যে ছিল করমে বঁধুর ভরমে
মরম তোমারে কই।
নিঁদের আলিসে বঁধুর ধাধসে
তাহারে করিনু কোড়ে।
ননদী উঠিয়ে বলিছে রুষিয়া
বঁধুয়া পাইলি কারে॥

এত টাট পণা   জানে কোন জনা
বুঝিনু তোহারি রীতি।
কুলবতী হয়ে   পরপতি লয়ে
এমতি করহ নিতি॥
যে শুনি শ্রবণে   পরের বদনে
নয়নে দেখিনু তাই।
দাদা [illegible] এলে   করিব গোচর
ক্ষণেক বিরাজ রাই॥
নিঠুর বচনে   কাঁপিছে পরাণ
মরিয়া রহিনু লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি   গরবেতে থাকি
সঘনে আমারে যাঁচে॥
এক হাতে সখি   কচলিয়া আখি
নয়ানে দেখি যে আর।
চণ্ডীদাস কয়   কিবা কুল ভয়
কানুর পিরীতি যার॥

প্রভু বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—"ঠিক্ কথা; তারপর স্বরূপ!" স্বরূপ আবার গাইলেন:—

আর এক দিন সখি শুতিয়া আছিনু।
বঁধুর ভরমে ননদীরে কোরে নিনু॥
বঁধু নাম শুনি সেই উঠিল রুসিয়া।
বলে তোর বঁধু কোথা গেল পলাইয়া॥
সতী কুলবতী কুলে জালি দিনু আগি।
আছিল আমার ভাগ্যে তোর বধ-ভাগি॥

শুনিয়া বচন তার অস্থির পরাণী।
কাঁপয়ে শরীর দেখি আখির তাজনি॥
এমত যে ডরি সখি পাপিনীর হাতে।
বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাথে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা, তার ততই পিরীতি॥

গান শেষ হইলে মহাপ্রভু বলিলেন, স্বরূপ, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। এই ভাব-রস-সম্ভোগই গত রাত্রিতে আমার অনুভূত হইয়াছিল। ননদিনীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন,—শ্রীরাধার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। শ্রীরাধা সততই শ্রীকৃষ্ণের ভাবরসে নিমগ্না। তিনি শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে সর্ব্বদাই সেই ভাবে বিভোরা। এমত অবস্থায় প্রতিকুল সঙ্গ সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য। এমন কি এরূপ স্থলে এক গৃহে থাকাও আশঙ্কাজনক। হয়তো ভাবের আবেশে হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলিয়া উচ্চরবে আহ্বান করাও অসম্ভব নহে। গত রাত্রিতে আমার মনে এই সকল কথা উত্থিত হইয়াছিল। শ্রীমতীর রসাবেশে এরূপ স্ফুর্ত্তির ন্যায় সম্ভোগও অনুভব করিতে ছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একই সময়ে তোমার মনেও আমার মনের ভাব খেলাইয়া বেড়াইতে ছিল। আমিও মনে করিতে ছিলাম এই সময়ে স্বরূপকে পাইলে এই সম্ভোগের কথা বলিতাম। স্বপ্নেও এইরূপ হওয়া স্বাভাবিক। প্রাণের স্বরূপ,—বিরহের জীবনে স্বপ্নও ক্ষণেকের তরে শান্তিপ্রদ। নিদাঘের মরুভূমের ন্যায় অনবরত যে জীবন বিরহের হা হুতাশেও অন্তর্দাহি জ্বালায় ছটফট করে, সে জীবনে স্বপ্ন যত দীর্ঘ হয়, ততই মঙ্গল। এ অবস্থায় নির্জ্জন আঁধার ঘরই প্রশস্ত স্থান। স্বপ্নের আবেশেও যদি মিলন হয় তাহাও প্রাণ-ধারণের কতকটা উপযোগী হয়। বিরহি

জীবনে প্রকৃত মিলনও স্বপ্নের ন্যায় নিমেষ মাত্র বলিয়া অনুভূত হয়। তাহাও বিরহের আশঙ্কাতে দুঃখজনকই হইয়া উঠে; "হারাই হারাই সদা ভয় পাই হারাইয়া ফেলি চকিতে।"—এ জ্বালা যার ঘটে, কেবল সেই সে বুঝিতে পারে। স্বরূপ, স্বপ্ন সম্বন্ধে ঠাকুর চণ্ডীদাসের একটি পদ আছে, সেটি তোমার স্মরণে আসিবে কি ?

স্বরূপ আবেগের সহিত বলিলেন, স্মরণে আসা কি প্রভো, এখনই সে পদটি আপনাকে শুনাইব বলিয়া মনে করিয়া ছিলাম; তবে এই শুনুন :—

পরাণ বঁধুকে স্বপনে দেখিনু
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া
ঈষৎ মধুর হাসে॥
পীত বরণ বসন খানিতে
মুখানি আমার মুছে।
শিথান হইতে মাথাটি রাখিয়া
শুতল আমার কাছে॥
মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া
বঁধুয়া করল কোলে।
চরণ উপরে চরণ পসারি
পরাণ পাইনু বলে॥
অঙ্গ পরিমল সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে রস উপজিল
জাগিয়ে হইনু হারা॥

কপোত পাখীকে চকিতে বাঁটুল
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে এমন হইলে
আর কি পরাণ রয়॥

স্বরূপের গান শেষ হইলে মহাপ্রভু বলিলেন শ্রীরূপ—ইহা স্বপ্নে সম্ভোগ। তোমায় পূর্ব্বেই আমি রসতত্ত্বের এই তথ্য বলিয়াছি” শ্রীরূপ করযোড়ে বলিলেন—আজ্ঞা হাঁ প্রভো, আপনার উপদেশ অনুসারে ইহা উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে আলোচনা করারও সঙ্কল্প করিয়াছি। প্রভুর কৃপা হইলে সময়ে ধারাবাহিক রূপে গ্রন্থাকারে সে আলোচনা লিপিবদ্ধ করিব।

মহাপ্রভু বলিলেন শ্রীরূপ, একটা কথা এস্থলে বক্তব্য এই যে শুদ্ধ সত্ত্বতনু আনন্দচিন্ময়-রস মূর্ত্তি ব্রজবালাদের বিশেষতঃ শ্রীরাধার—রজোগুণ সমুত্থ সাধারণ স্বপ্নের ন্যায় স্বপ্ন হওয়া অসিদ্ধ। বিশ্ব, তৈজস প্রাজ্ঞ এই তিন অবস্থায় স্বপ্ন সম্ভাবিত হয়। স্থূলতম জাগতিক ব্যাপার বিশ্ব নামে অভিহিত, ইহা হইতে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম তথাপি স্থূল মধ্যে গণ্য তৈজস স্বপ্নাবস্থা, ইহা হইতে সূক্ষ্ম তথাপি প্রাকৃত বিজ্ঞান-ব্যাপারোত্থ স্বপ্নই প্রজ্ঞাবস্থার স্বপ্ন। ইহার পরের অবস্থা—স্বরূপানুভব-সমাধি জাত স্বপ্ন। সচ্চিদানন্দময়ী ব্রজদেবীদের স্বপ্ন এই চারি অবস্থাকে অতিক্রম করে নচেৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন সিদ্ধ হয় না। প্রাকৃত স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন অসম্ভব। তাই তোমায় বলিয়াছিলাম :—

ব্যতীত্য তুর্য্যমপি সংশ্রিতানাং
তাং পঞ্চমীং প্রেমময়ীমবস্থাম্
ন সম্ভবত্যেব হরিপ্রিয়াণাং।
স্বপ্নো রজোবৃত্তিবিজৃম্ভিতো যঃ॥

এই স্বপ্নে প্রাপ্তি-বিশেষ—গৌণ প্রাপ্তি নামে অভিহিত। সামান্য-বিশেষ ভেদে এই স্বপ্ন চতুর্ব্বিধ। বিশেষ স্বপ্ন ঠিক জাগরণ অবস্থারই তুল্য। উহা স্বপ্ন হইলেও স্বপ্ন বলিয়া মনে হয় না। ঠিক জাগরণ অবস্থার মিলনের ন্যায় অনুভূত হয়। শ্রীরূপ, জ্ঞানের এই প্রকার-ভেদ গুলির স্থূল সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম ও অতি প্রাকৃত সবিশেষ সূক্ষ্মতম অবস্থা ভেদের বিচার করিলে বিস্মিত হইতে হয়। জাগরণ অবস্থার তুল্য স্বপ্নজ্ঞান এক অদ্ভুত ব্যাপার—ইহা অতীব ভাবোৎকণ্ঠ্যময়। এই বিশেষ অবস্থাপন্ন স্বপ্ন আবার চতুর্ব্বিধ—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও স্বাপ্ন সমৃদ্ধিমান্। তুমি তোমার উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে উদাহরণাদি দ্বারা এই সকল লক্ষণের সবিস্তার আলোচনা করিও।

শ্রীপাদ শ্রীরূপ মস্তক অবনত করিয়া করজোড়পূর্ব্বক বলিলেন সে সকলই প্রভুর কৃপায় ভক্তগণ জানিতে পারিবেন। ভীষণ বিরহে স্বপ্নে সম্মিলনেও প্রাণরক্ষার উপায় হয়।

মহাপ্রভু বলিলেন চণ্ডীদাস ঠাকুরের পদগুলি যেন প্রত্যক্ষে লীলা-বর্ণন। ইহা স্ফূর্ত্তির দর্শন বলিয়াও মনে করা যায় না। ইহার উপরে স্বরূপের সুকণ্ঠ, তাহার উপরে ভাবাবেশে বিহ্বল অবস্থায় যখন স্বরূপ গান করেন, তখন ব্রজরস একবারে মূর্ত্তিমান্ হইয়া দেখা দিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মাহাত্ম্যই এই যে ইহা জীবের অবিদ্যার আবরণ উন্মোচন করে, তাহাতে পাপ তাপ দূর হয়, অনর্থ নিবৃত্তি হয়, ভজনে প্রবৃত্তি জন্মে, নামগানে রুচি হয় অবশেষে জীবের বিশুদ্ধ সত্ত্বাবস্থা প্রকট হইয়া পরম পুরুষার্থ প্রেমের উদয় হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলাকীর্ত্তন যে সাধনার শ্রেষ্ঠতম উপায় ঋষিগণের এই উক্তি অতীব সুসঙ্গত বটে।

শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন, প্রভো, শ্রীরাধার রজনী-বিলাসের একটী পরিতাপের পদ মনে পড়িতেছে। শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের হৃদয়ে যে কত

প্রকার লীলার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে পদটীর কথা বলিতে ছিলাম, তাহা এই ঃ—

সই কি আর বলিব তোরে।
অনেক পুণ্যের ফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলিল মোরে॥
এঘোর রজনী মেঘ ঘটা, বন্ধু
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বন্ধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।
নহি স্বতন্তরী গুরু-জনা-ডরে
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরিমরি সঙ্কেত করিয়া
কতনা যাতনা দিনু॥
বঁধুর পিরীতি আদর দেখিতে
মোর মন হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
অনল ভেজাই ঘরে॥
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখেতে দুখী।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
শুনিতে জগৎ সুখী॥

স্বরূপ যখন গাইতেছিলেন তখন মহাপ্রভু মস্তক অবনত করিয়া বামকরে কপোল রাখিয়া বিষণ্ন মুখে গান শুনিতে ছিলেন, আর নয়ন-জলে প্রভুর কপোল ভাসিতেছিল। শ্রোতাদের অবস্থাও তদ্রূপ। কিয়ৎক্ষণ

পরে অশ্রুসিক্ত মুখে মহাপ্রভু বলিলেন,—স্বরূপ শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমের রীতি শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের পদে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে আর কুত্রাপি সেরূপ দৃষ্ট হয় না।

স্বরূপ, এই পদের প্রত্যেক কথা এমনই ভাবে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, যে আমি কোনও ক্রমে আত্ম সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। অনুরাগ লক্ষণে রস শাস্ত্রকারগণ যাহা যাহা বলিয়াছেন, চণ্ডীদাসের পদের সমক্ষে সে সকল অতি অকিঞ্চিৎকর,—তাহার উপরেও অনন্ত ভাব-লহরী চণ্ডীদাসের প্রত্যেক বাক্যে ব্যঞ্জিত হইয়া ভাবুক হৃদয়ে ভাব-সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া দেয়। আগ্নেয় গিরির নিঃস্রবের ন্যায় শ্রীরাধার ভাবোচ্ছ্বাস শ্রোতৃমাত্রেরই হৃদয়ে জ্বালামালার সঞ্চার করে।

আঙ্গিনার মাঝে বন্ধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।

লক্ষ কথার উপর এই এক কথা। শ্রীমতী বলিতেছেন আমি তো স্বতন্ত্রা নই, পরাধীনা, দুর্জ্জন গুরুজনের ভয়ে ব্যাধ বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় অথবা বেড়াজালে বদ্ধা শফরীর ন্যায় আমার কোনও স্বাধীনতা নাই। অথচ প্রাণের আবেগে সঙ্কেত না করিয়াও স্থির থাকিতে পারি নাই। এখন সঙ্কেত করিয়া তো এই দশা। বন্ধুর সাড়া পাওয়া মাত্র তাহার নিকট গিয়া যে দাঁড়াইব, সে ক্ষমতাও আমার নাই! অথচ আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া বর্ষার জলে তাঁর কত ক্লেশ! কিন্তু তিনি তো আমার জন্য কোনও ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া মনে করেন না। একে আন্ধার রাতি তাহাতে আবার মেঘের ঘটা। আমার বাসনায় সঙ্কেত স্থলে আসিয়া বন্ধুর কি ক্লেশ—ইহা সহিয়াও আমার প্রাণ আছে! আমার জীবনে ধিক্, কেবল কলঙ্কের ভয়েই তো এত? এখন মনে হইতেছে, বন্ধুর

লাগিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া তাঁহার চরণতলে চির জীবনের তরে আত্ম সমর্পণ করিব। আমাকে দেখার জন্য যত দুঃখ, তাহা তিনি দুঃখ বলিয়া মনে করেন না প্রত্যুত সুখ বলিয়াই মনে করেন। কেবল আমার দুঃখেই তাঁহার দুঃখ। এ অবস্থায় আমি কি করিয়া জীবন ধারণ করিব।”

স্বরূপ, আমি কিছুতেই আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না। মনে হইতেছে বিরলে বসিয়া কেবলই তোমার গানের পদগুলি আবৃত্তি করিতে করিতে নয়ন জলে প্রাণের জ্বালা জুড়াই। এই বলিয়া মহাপ্রভু অবিরল ধারায় কাঁদিতে লাগিলেন। রাম রায় প্রভুর বহির্বাসে তাহার নয়ন জল মোছাইয়া দিয়া তাঁহার মস্তক নিজের বক্ষে কোমল করে জড়াইয়া ধরিলেন। মহাপ্রভু রাম রায়ের কোলে মাথা রাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

শ্রীরূপ বলিলেন- ঠাকুর মহাশয় এখন গান থাকুক। প্রভুর এ দশা দেখিয়া স্থির থাকা যায় না। শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন—ইহাই তো এখানকার নিত্য দুঃখ বা নিত্য আনন্দ। ইহা লইয়াই প্রভু জীবন রক্ষা করেন। এ স্রোত বন্ধ হইলে জীবন-রক্ষাই তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। প্রভুর ইহাতেই প্রীতি। সেই প্রীতি দানের জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। এই যাতনা লইয়াই প্রভু প্রাণ-ধারণ করেন। আমরা নীরব থাকিলে এক মুহূর্ত্তও তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। এই ভাবেই প্রভুকে লইয়া আমাদের দিন রজনী যাপন করিতে হয়। এই সকল পদ গান না শুনিলে প্রভু স্থির থাকিতে পরেন না, শুনিলেও তো এই দশা হয়। আমরা কি করিব, বলুন। এইজন্য স্নেহময় গোবিন্দ দাস আমাদের প্রতি সময়ে সময়ে রুষ্ট হন, এই রূপ গান গাইতে বাধা দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার প্রভু যে এক মুহূর্ত্তও এই বিরহ জ্বালার পদাবলী আস্বাদ-গ্রহণ ভিন্ন

জীবন ধারণ করিতে পারেন না। তিনি তাহা বুঝিয়াও বোঝেন না। গম্ভীরা মন্দিরে ইহাই এক নিত্য সঙ্কট।

মহাপ্রভু বলিলেন স্বরূপ, আর কথান্তরের প্রয়োজন নাই। সান্নি-পাতিক রোগীর জল তৃষ্ণার ন্যায় ক্ষণতরে এই লীলাগান না শুনিলেই আমার প্রাণ মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক হয়, আমি যে কিছুতেই ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না; আবার কিছু বল!

শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন, শুন্‌লেন তো রূপঠাকুর! এই বলিয়া পদ ধরিলেন ঃ—

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতুলি
নিমিখে নিমিখে হারা॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিনু শ্যাম বঁধু বিনে
আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও ধরম করম
মন স্বতন্ত্র নয়।
কুলবতী হৈয়া পিরীতি আরতি
আর কার জানি হয়॥
যে মোর করমে লিখন আছিল
বিধি ঘটাইল মোরে।
তোরা কুলবতী দেখিলে কুমতি
কুল লয়ে থাক ঘরে॥

গুরু দুরজন বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে এ তনু বেচিনু
তিল তুলসী দিয়া॥
পড়শী দুর্জ্জন বলে কুবচন
না যাব সে লোক-পাড়া।
চণ্ডীদাস কয় কানুর পিরীতি
জাতি কুল শীল ছাড়া॥

ভাবনিধি শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সততই ভাবরসে সমুদ্রের ন্যায় তরঙ্গায়িত যেই শ্রীপাদ স্বরূপ গানটী আরম্ভ করিলেন, আর অমনি মহাপ্রভু ধ্যান-স্তিমিত মহাযোগীর ন্যায় নয়ন নিমিলিত করিয়া গান শ্রবণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার শ্রীঅঙ্গে নানা ভাবের তরঙ্গ খেলা করিতে লাগিল। শ্রীচরিতামৃতে যে সকল সঞ্চারী ভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে শ্রীপাদ রূপ ও শ্রীপাদ রায় মহাশয় মহাপ্রভুতে একটির পর একটি করিয়া সেই সকল ভাব-তরঙ্গ প্রতিফলিত দেখিয়া বিস্ময়ে বিভোর হইলেন। গান শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভু বিবশ হইয়া পড়িলেন:— শ্রীপাদ রাম রায়ের স্কন্ধে শ্রীমস্তক রক্ষা করিয়া প্রভু নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীপাদ স্বরূপ আবার গাইতে লাগিলেন:—

১। এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুহু কোলে দুহু কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনা মীন যেন কবহু না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কভু না শুনিয়ে॥

ভানু কমল বলি সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় না হ'লে সেহ না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপে কহি সেহ নহে তুল।
না এলে ভ্রমরা আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহু সম নহে॥
ত্রিভুবনে হেন নাই চণ্ডীদাস কহে॥

২। এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোলে দূর মানি॥
সম্মুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥
এক তনু হয়ে মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি মোর প্রাণ যেন চলি যায়॥
সে কথা বলিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে সই সব পরমাণ॥

মহাপ্রভু ধীরে ধীরে মস্তক তুলিয়া বলিলেন, স্বরূপ, চণ্ডীদাসের পদ উক্তি সিদ্ধান্তের সার। "মানুষে এমন প্রেম কভু না শুনিয়ে।" মানুষের প্রেম যত উচ্চতম হউক না কেন, কিন্তু এমন ভাবটী আর কোথাও নাই :—

অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।

যদি হয় তার যোগ না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥

এই আদর্শ-উপাসনা দেখিয়াই প্রেমভক্তির উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীরূপ, এই মহা ভাবময় প্রেমের কথাই আমি তোমায় বলিয়াছি, রায় মহাশয়ের শ্রীমুখেও এই আদর্শ প্রেমের কথাই শুনিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের একান্ত প্রিয়জনের হৃদয়ই এই ভাবের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। তাহাদের মধ্যেই ইহার নিত্য প্রকাশ। শুদ্ধ জীবের ইহাই স্বরূপ। কিন্তু অবিদ্যাকৃত জীবে ইহার প্রাকট্য নাই, তবে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত কৃপায় সাধনবশে শুদ্ধ চিত্তে এই নিত্য ভাবের উদয় হয়। স্বরূপ, চণ্ডীদাসের পদে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা বর্ণন অফুরন্ত বলিয়া মনে হয়। তাঁহার পদাবলী অনন্ত ভাব-রসের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

স্বরূপ বলিলেন, যথার্থ বটে, প্রভো। শ্রীমতীর বিপ্রলব্ধা অবস্থার একটি পদ মনে পড়িল, এই শুনুন :—

দুকাণ পাতিয়া ছিল এতক্ষণ
বঁধু পথ পানে চাই।
পরভাত নিশি দেখিয়া অমনি
চমকি উঠিল রাই ॥
পাতায় পাতায় পড়িছে শিশির
সখীরে কহিছে ধনী ॥
বাহির হইয়া দেখলো সজনী
বঁধুর শবদ শুনি ॥
পুন কহে রাই না আসিল বঁধু
মরমে রহল ব্যথা।

কি বুদ্ধি করিব পাষাণে পড়িয়া
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥
ফুলের এ ডালা ফুলের এ মালা
সেজ বিছাইয়া ফুলে।
সব হৈল বাসি আর কেন সই
ভাসা লো যমুনা জলে ॥
কুঙ্কুম কস্তুরী চুবক চন্দন
লাগিছে গরল হেন।
তাম্বুল বিরস ফুল হার ফণী
দংশিছে হৃদয় যেন ॥
সকল লইয়া যমুনায় ডার
আর তো না যায় দেখা।
ললাট সিন্দুর মুছি কর দূর
নয়ানের কাজল রেখা ॥
আর না রাখিব এ ছার পরাণ
না যাব লোকের মাঝে ॥
স্থির হও রাই চলু চণ্ডীদাস
আনিতে নিঠুর-রাজে ॥

মহাপ্রভু বলিলেন, প্রাণের স্বরূপ, শ্রীরাধাপ্রেমের কি ভীষণ মর্ম্মদাহী ভাব! আমি যে কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছি না। এতো চণ্ডীদাসের রচনা নয়—এ যেন স্বয়ং শ্রীমতীরই শ্রীমুখের জ্বালাময়ী উক্তি। শ্যাম-বিরহে বিপ্রলব্ধা শ্রীমতীর এই মর্ম্মদাহি বাণী শুনিয়া জগতে এমন পাষণ্ড কে আছে যে স্থির থাকিতে পারে। কেবল নিঠুরকে দেখার আশায় তাঁহার পথপানে চেয়ে থাকা—আর প্রতি মুহূর্ত্ত যুগের ন্যায় মনে

করা—এইরূপে আসার আশায় সারা রজনী শ্রীমতী কত কল্পনা জল্পনা করিয়া নিশি যাপন করিতে ছিলেন। ফুলের মালা গাঁথিলেন, তাঁহাকে পরাইবেন বলিয়া—ফুলের শয্যা করিলেন, কুসুম শয্যায় তাঁহাকে শোয়াইয়া সেবা করিবেন বলিয়া—হায় হায় নিশি প্রভাত হইয়া গেল, তরুণ অরুণ কিরণে পাখী সকল জাগিয়া উঠিল, ব্রজকুঞ্জের পাতায় পাতায় টুপ্‌টাপ শব্দে শিশির পড়িতে লাগিল—প্রত্যেক কোমল শব্দেই তিনি শ্যামসুন্দরের আগমনের আশা করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি আসিলেন না,—সকল আশাই বিফল হইয়া গেল—যত্নে তোলা প্রত্যেক ফুলই যেন তাঁহার হৃদয়ে শেলের মত যাতনা দিতে লাগিল। এই রূপ আশাভঙ্গে শ্রীমতীর অন্তরের যাতনা তিনি নিজেই যেন শ্রীপাদ চণ্ডী-দাসের শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। স্বরূপ, তোমার কণ্ঠেও তাহারই আবি-র্ভাব। স্বরূপ, শ্রীরাধার বিপ্রলব্ধা অবস্থা শুনিয়া আমাতে আর আমি নাই। কি সর্ব্বনাশ? এই কি সুহৃদের কাজ—হায় হায় একি হইল—এই বলিয়া মহাপ্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে ঢলিয়া পড়িলেন। রাম রায় আপন কোলে তাঁহার শ্রীমস্তক রক্ষা করিলেন, স্বরূপ ব্যজন করিতে লাগিলেন; শ্রীরূপ, স্তম্ভিত হইয়া চরণ তলে বসিয়া শ্রীচরণে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

স্বরূপের গান-শ্রবণে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভাব-তরঙ্গ সমুচ্ছসিত হইয়া যেরূপ দশা উপস্থিত হয়, তাহাতে গান বন্ধ রাখাই ভাল। কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই। এই অবস্থার পরক্ষণেই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—স্বরূপ, তারপরে তারপরে?

স্বরূপ কর জোড় করিয়া বলিলেন দয়াময় একটুকু বিশ্রাম করুন। আপনার অবস্থা দেখিয়া আমরা স্থির থাকিতে পারি না। বিশেষতঃ আপনার স্নেহময় গোবিন্দদাস আমারের প্রতি ইহাতে বড় রুষ্ট হন।

হইবারই কথা। আপনাকে সুস্থির দেখিলেই গম্ভীরার সেবকগণের আনন্দ। ভাবে ভাবে ভাবশাবল্যে আপনার হৃদয় যখন বিক্ষুব্ধ হয় তাহা দেখা আমাদের পক্ষে প্রীতিজনক হয় না, প্রত্যুত ক্লেশজনকই হইয়া উঠে।

প্রভু বলিলেন স্বরূপ, তোমরা ঐ অবস্থায় আমাকে যে স্থির দেখিতে পাও তাহা প্রকৃত স্থিরতা নহে—তখন বাহ্য দৃষ্টিতে স্থির দেখিলেও আমার হৃদয় কার্য্যতঃ অত্যন্ত অধীর থাকে; তাহা অপেক্ষা বরং লীলা গান শ্রবণে আমি আনন্দে থাকি। যাতনা হইলেও উহাতে আনন্দ আছে। তুমি নীরব থাকিও না। তুমি ও রায় রায় নীরব থাকিলে আমি আমার হৃদয় ক্ষেত্রকে শ্মশানের ন্যায় শূন্য মনে করি। তুমি নীরব থাকিও না।

তখন শ্রীপাদ স্বরূপ প্রভুর হৃদয়ে অন্য ভাব আনয়নের জন্য খণ্ডিতার পদ গাইতে লাগিলেন—চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে প্রভাতে শ্যাম সুন্দর শ্রীরাধার কুঞ্জে উপনীত হইলেন। তাঁহার শ্রীমুখ মণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীরাধার দুঃখের ও ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি বলিতেছেন—

ছুঁইওনা ছুঁইওনা বন্ধু ওইখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখ খানি দেখ॥
নয়ানের কাজর বদনে লেগেছে
কালর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া ওমুখ দেখিলাম
দিন যাবে আজ ভাল॥
অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।

আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
নয়ন ভরিয়া দেখি ॥
চাঁচর কেশের চিকণ চূড়া
সে কেনে বুকের মাঝে ॥
সিন্দুরের দাগ আছে সর্ব্ব গায়
মোরা হলে মরি লাজে ॥
নীল কমল ঝামর হয়েছে
মলিন হয়েছে দেহ ॥
কোন রসবতী পেয়ে সুধানিধি
নিঙ্গরি লয়েছে সেহ ॥
কুটীল নয়নে কহিছে সুন্দরী
অধিক করিয়া তোড়া।
কহে চণ্ডীদাস আপন স্বভাব
ছাড়িতে না পারে চোরা ॥

গান শুনিয়া মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন, রামরায়, শ্রীমতী ঠিক কথাই বলিয়াছেন। স্বরূপ, তার পর ?” স্বরূপ গাইলেন—

এস এস বন্ধু করুণার সিন্ধু
রজনী গোয়ালে ভালে।
রসিকা রমণী পেয়ে গুণমণি
ভাল তো সুখেতে ছিলে ॥
নয়ানে কাজর কপালে সিন্দুর
ক্ষত বিক্ষত হে হিয়া।
আখি ঢরঢর পড়ি নীলাম্বর
হরি এলে হর সাজিয়া ॥

ধিক্ ধিক্ নারী পর-আশা ধরি
কি বলিব বিধি তোরে।
এমত কপট লম্পট-শঠ
হাতেতে সঁপিলি মোরে॥
কাঁদিয়া যামিনী পোহালেম আমি
তুমি তো সুখেতে ছিলে।
রতি চিহ্ন সব দেখায়ে মাধব
প্রভাতে দেখাতে এলে॥
এ মিনতি রাখ ঐ খানে থাক
আঙ্গিনাতে নাহি এস।
ছুইলে তোমারে ধরমে আমারে
না করিবে গো পরশ॥
লোক মুখে কত শুনিতাম যত
প্রতীত হলো হে সব।
চণ্ডীদাস কয় নাগর দয়াময়
এতো দয়ার স্বভাব॥

প্রভু বলিলেন, এত টিটকারী শুনিয়া শঠ লম্পট ধূর্ত্ত-শিরোমণি কি বলিলেম স্বরূপ?

স্বরূপ গাইলেন :—

শুন শুন সুন্দরী আমার যে রীতি।
কহিতে প্রতীত নহে জগতে বিদিত॥
তুমি না মানিবে তাহা আমি ভাল জানি।
এতেক না কহ ধনী অসম্ভব বাণী॥

সঙ্গত কহিলে ভাল শুনিতে হয় সুখ।
অসঙ্গত কহিলে শুনিতে পাই দুখ॥
মিছা কথায় কত পাপ জানত আপনি।
জানিয়া না জানে সেই অধম পাপিনী॥
পরে পরিবাদ দিলে ধরম সবে কেনে।
তাহার এমন রীত হইবে কেমনে॥
চণ্ডীদাস বলে যদি মিছা বলে থাকে।
সেই সে ডুবিবে পাপে তোমার কিবা যাবে॥

প্রভু বলিলেন—ধাষ্ট্যামির চূড়ান্ত বটে। রসসাগর নাগরের চাতুর্য্যময় বাক্যে বিদগ্ধা-শিরোমণি শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী অবশ্যই নীরব ছিলেন না। তিনি কি বলিলেন?

স্বরূপ বলিলেন—ইহার উপযুক্ত উত্তরই নাগররাজ শুনিতে পাইলেন। শ্রীমতী ভ্রূভঙ্গী ও তর্জ্জনি উত্তোলন করিয়া বলিলেন :—

ভাল ভাল ভাল কালিয়া নাগর
শুনালে ধরম কথা।
পরের রমণী মজালে যখন
ধরম আছিল কোথা॥
চোরের মুখেতে ধরম কাহিনী
শুনিতে পায় যে হাসি।
পাপ পুণ্য জ্ঞান তোমার যতেক
জানয়ে বরজবাসী॥
চলিবার তরে দাও উপদেশ
পাথর চাপিয়া পিঠে।

বুকেতে মারিয়ে চাবুকের ঘা
তাহাতে মুনের ছিটে ॥
আর না দেখিব ও কাল মুখ
এখানে রহিলে কেনে।
যাও চলি যথা মনের মানুষ
যেখানে পরাণ টানে ॥
কেন দাঁড়াইয়া পাপিনীর কাছে
পাপেতে ডুবিবে পাছে।
কহে চণ্ডীদাস যাও চলি যথা
ধরমের থলী আছে ॥

মহাপ্রভু বলিলেন—শ্রীমতী ঠিক উত্তরই দিয়াছেন। ইহার পরে শ্যামচাঁদ কি বলিলেন? স্বরূপ বলিলেন, আর কি বলিবেন, শঠের যেমন কথা তেমনই বলিলেন—বলিলেন, ওগো ধনি মিছে কেন এত অপমান কর। তুমি ক্রোধে এতই অধীরা হইয়াছ যে ভাল করিয়া কিছুই দেখিতেছ না। আমি বাঁশী পরশ করিয়া শপথ করিয়া বলিতেছি তোমা ভিন্ন আমি কিছুই জানি না। আমার কপালে ফাগুর বিন্দু দেখিয়া তুমি সিন্দুর মনে করিতেছ, তোমার জন্য ব্যাকুল হইয়া পথ অপথ না দেখিয়া কণ্টকের বন দিয়া তাড়াতাড়ি আসিতেছিলাম, তাহাতেই বক্ষে আঁচর লাগিয়াছে। তুমি বলিতেছ উহা কঙ্কণের দাগ? এই কি ঠিক দেখা?" এই বলিয়া শ্যামসুন্দর শ্রীরাধার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলেন। আর যেন অমনি প্রেমময়ী শ্রীকৃষ্ণভাবিনী তাঁহাকে না দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দ্বারে ললিতার সঙ্গে দেখা হইল। ললিতাও ছাড়িবার পাত্রী নহেন তিনি চোখা চোখা কথায় ধৃষ্ট-শিরোমণিকে ভালরূপেই শিক্ষা দিলেন।

প্রভু বলিলেন, ভাল কথা,—চতুরা ললিতা কি বলিলেন? তখন স্বরূপ গাইলেন :—

ললিতা কহয়ে শুনহে হরি।
দেখে শুনে আর রহিতে নারি॥
শুন শুন ওহে রসিক রাজ।
এই কি তোমার উচিত কাজ॥
উচিত কহিতে কাহার ডর।
কিবা বা সে আপন কিবা সে পর॥
শিশুকাল হৈতে স্বভাব চুরি।
সে কি পারে রৈতে ধৈরজ ধরি॥
এক ঘরে যদি না পোষে তায়।
ঘরে ঘরে ফিরে, পায় বা না পায়॥
সোনা লোহা তামা পিতল কি বাছে।
চোরের কি কখন নিবৃত্তি আছে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস এ রস কয়।
চোরের মনশুদ্ধি কখনো নয়॥

ললিতার স্পষ্ট কথা শুনিয়া মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন স্বরূপ, গোপীদের এই ভৎ‍র্সনা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের যে আনন্দ, ব্রাহ্মণদের মুখে বৈদিক স্তুতিতে শ্রীগোপীবল্লভের ইহার কোটি অংশের এক অংশ আনন্দও হয় না। শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গল যথার্থই বলিয়াছেন :—

গোপালাজিরকর্দ্দমে বিহরসে বিপ্রাধ্বরে লজ্জসে
ব্রুষে গোধনহুঙ্কৃতৈঃ স্তুতিশতৈঃ মৌনং বিধৎসে সতাম্
দাস্যং গোকুল পুংশ্চলীষু কুরুষে স্বাম্যং ন দান্তাত্মনাম্
জ্ঞাতং কৃষ্ণ তবাঙ্ঘ্রি যুগলং প্রেমাচলং মঞ্জুলম্।

হে কৃষ্ণ, তোমার মনোরম পাদপদ্মযুগল যে প্রেমেই বশীভূত, তাহা এক প্রকার জানাই আছে। শ্রীব্রজধামে গোয়ালাদের কর্দ্দমপূর্ণ আঙ্গিনায় তুমি মহানন্দে বিরাজ কর, অথচ বৈদিক কর্ম্মনিরত অতি পবিত্র যজ্ঞস্থলে আমন্ত্রণ করিয়াও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ তোমাকে প্রাপ্ত হন না। গোষ্ঠে ধেনুগণের হাম্বারবে তুমি প্রতি হুঙ্কারে গোষ্ঠস্থলী মুখরিত করিয়া তোল কিন্তু বিপ্রগণ শত শত স্তুতিতে যখন তোমার স্তব করেন, তখন প্রতিদানে তোমার মুখের একটা সাড়াও শুনিতে পাওয়া যায় না। সংযতআত্মা যোগিগণের উপরে প্রভুত্ব করিতেও তোমার আগ্রহ দেখিতে পাই না, অথচ গোকুলের কুলটা বালাদের দাসত্ব করিতে তোমার পূর্ণ উৎসাহ ও উত্তম! ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে তুমি কেবল প্রেমেরই বশীভূত।

শ্রীভগবানের উক্তি এই যে :—

আমাকে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন।
আমি প্রেম-বশ ; তার না হই অধীন॥

অথবা—

প্রেম-বশ আমি ;—তার নাহই অধীন॥ *

---

* কিন্তু কোন কোন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই পংক্তির যে পাঠ আছে তাহা এই :—

তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন।

এই পাঠে সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে অর্থ-বোধ কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। 'তার' এই পদের পরে কেবল ড্যাস (—) এই চিহ্ন দিলে প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি হইতে পারে। তার—(প্রেমেবশ আমি)—না হই অধীন। অর্থাৎ প্রেম-বশ আমি তার অধীন হই না—কেনন প্রেমাধীন হওয়াই আমার স্বভাব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বলিলেন, স্বরূপ শ্রীল বিল্বমঙ্গলের আরও একটি পদ্যে এইভাবের কথা আছে যথা :—

যা শেখরে শ্রুতিগিরাং হৃদি যোগভাজাং
পাদাম্বুজে চ সুলভা ব্রজসুন্দরীণাম্
সা কাপি সর্ব্বজগতামভিরাম সীমা
কামায় নো ভবতু গোপকিশোর মূর্ত্তিঃ

শ্রুতিবাক্য সমূহের সমুচ্চ শেখরে।
ধ্যানী জ্ঞানী যোগীদের হৃদয়-মাঝারে॥
খুঁজিলেও নাহি মিলে যাহার চরণ।
গোপীদের পদে পাবে তার দরশন॥
সর্ব্ব জগতের যাহা অভিরাম সীমা।
প্রেমভক্তি দিন্ সেই গোপাল-প্রতিমা॥

অতঃপরে মহাপ্রভু বলিলেন, শ্রীরূপ এখন মানের পদ শুনিবার বাসনাই স্বাভাবিক কি বল তুমি? শ্রীরূপ করযোড়ে বলিলেন আজ্ঞা হাঁ প্রভো। শ্রীপাদস্বরূপ ঠাকুরের কৃপা হইলেই হয়। মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন, স্বরূপের কৃপার কথা বলিতেছ, স্বরূপ আমার প্রতি চিরদিনই কৃপালু। যে দিন স্বরূপ আমাকে মনে করিয়া বিশ্বেশ্বরের ধাম কাশী হইতে এখানে আসিলেন সেই দিন হইতেই এই কুটীর আনন্দের নিত্য নিকেতন হইয়া উঠিল। অন্ধ এক চক্ষু পাইলেই আনন্দিত হয় ইহার উপরে সে যদি দুই চক্ষু পায়, তবে কি তাহার আনন্দের অবধি থাকে? তাই স্বরূপকে পাইয়া আমি বলিয়াছিলাম—

তুমি যে আসিবে তাহা পূর্ব্বেই জানিল।
ভাল হলো,—অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল॥

ফলতঃ আমার এই অবস্থায় রামরায় ও স্বরূপ আমার জীবন রক্ষক। রামানন্দের কৃষ্ণ কথায় এবং স্বরূপের লীলাগানে আমি কোন প্রকারে প্রাণ ধারণ করি।

আমরা বিপ্রলব্ধা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শুনিয়াছি। বিপ্রলব্ধার পরে খণ্ডিতার পদও শুনিলাম। খণ্ডিতার পরে মানই স্বাভাবিক। স্বরূপ এখন মানের একটি পদ শুনিতে সাধ হইতেছে। স্বরূপ তখন যে পদ ধরিলেন,—তাহা শ্রীরাধার উক্তি। শ্রীরাধা কৃষ্ণের ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়া বলিতেছেন :—

উহার নাম করো না, নামে মোর নাহি কাজ।
উনি করেছেন ধর্ম্মনষ্ট ভুবন ভরি লাজ॥
উনি নাটের গুরু সই উনি নাটের গুরু।
উনি করেছেন কুলের বাহির নাচাইয়া ভুরু॥
এনে চন্দ্র হাতে দিলেন যখন ছিল উহার কাজ।
এখন উহার অনেক হলো, আমরা পেলাম লাজ॥
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলী আদেশে।
উহার সনে লেহ করি এই হলো শেষ॥

গান শুনিয়া মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, প্রকৃত দুঃখের কথাই বটে। শ্রীমতীর ধর্ম্মনাশের মূল উনিই বটেন। কেবল যে শ্রীমতীর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছেন তাহা নহে। ধর্ম্মনাশ করাই উহার উপদেশ ও কার্য্য। উনি স্বয়ং উঁহার প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়া উহার পদান্তিকে টানিয়া আনাই উঁহার কার্য্য। দেহ ধর্ম্ম, ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম, প্রাণের ধর্ম্ম, মনের ধর্ম্ম, বুদ্ধির ধর্ম্ম,

জ্ঞানের ধর্ম্ম, লোক ধর্ম্ম, সমাজ ধর্ম্ম, বেদ ধর্ম্ম, সতী ধর্ম্ম, সকল ছাড়াইয়া কেবল উঁহার দিকে চেয়ে থাকাই উঁহার উপদেশ। উনি সংসারে গার্হস্থ্য প্রভৃতি কোন ধর্ম্মেই জীবকে আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছুক নহেন। উঁহার আকর্ষণে ব্রজবালাগণ দেহ ধর্ম্ম, লোক ধর্ম্ম, বেদ ধর্ম্ম লজ্জা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া উঁহাতে আত্ম বিসর্জ্জন করিলেন। শ্রীমতী যথার্থই বলিয়াছেন যে উনি প্রকৃতপক্ষেই ধর্ম্মনাশা। উঁহার ভ্রুভঙ্গী মাত্রেই সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জীবগণ সকল ভুলিয়া উঁহার শ্রীচরণে আকৃষ্ট হয়, কুল ত্যাগ করিয়া অকুলে আত্মবিসর্জ্জন করে। ধর্ম্মে ও প্রেমভক্তিতে অনেক প্রভেদ। ধর্ম্ম,—সাধনার প্রথম সোপান। ধর্ম্ম দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হয়, চিত্ত-শুদ্ধির পরে নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞান উপজাত হয় তখন বিষয় বাসনা সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। তাহার পরে প্রেমভক্তির উদয় হয়। উনি গীতায় নিজ মুখে এইরূপই বলিয়াছেন :—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার পরেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার পরে আনন্দ-জিজ্ঞাসা—এই আনন্দ-জিজ্ঞাসার পরেই—পিরীতি জিজ্ঞাসা। সুতরাং সর্ব্বশেষে চণ্ডীদাস ঠাকুরের শ্রীশ্রীরাধারাণীর ভাবপ্রবাহ।

এই মান কেবল প্রেম প্রবাহেরই ভাবান্তর। প্রেমই অবস্থা বিশেষে মানে পরিণত হয়। যেখানে প্রেম বেশী সেখানে কথায় কথায় মান। প্রেম গাঢ় হইলেই মান ঘটে। মান সম্বন্ধে তোমার মুখে বহুবার পদগান শ্রবণ করিয়াছি। এখন শ্যামসুন্দর মানভঙ্গের জন্য কি উপায় করিলেন, তৎসম্বন্ধে একটি পদ শুনাও। স্বরূপ পদ ধরিলেন :—

না ভাঙ্গিল মান দেখি চতুর নাগর।
বিশাখারে ডাকি কহে বচন উত্তর॥

শুনহ আমার কথা বিশাখা সুন্দরী।
আমারে সাজায়ে দেহ নবীন এক নারী॥
চূড়াধরা তেয়াগিয়া কাচুলী পড়িল।
নাপিতিনী বেশ ধরি নাগর দাড়াল॥
জয়রাধে শ্রীরাধে বলি করিল গমন।
রাইয়ের মন্দির আসি দিল দরশন॥
কি লাগি ধূলায় প'ড়ে বিনোদিনী রাই।
এস এস তুয়া পদে যাবক পড়াই॥
চরণ মুকুরে শ্যাম নিজ মুখ দেখে।
যাবকের ধারে ধারে নিজ নাম লেখে॥
সচকিত হয়ে ধনী চরণ পানে চায়।
আচম্বিতে শ্যাম অঙ্গের গন্ধ কেন পায়॥
ঈঙ্গিতে কহিলা তখন বিশাখা সুন্দরী।
নাপিতিনী নহে—তোমার নাগর বংশীধারী॥
বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে।
আর না করিবে মান চণ্ডীদাস বলে॥

মহাপ্রভু বলিলেন এ অতি উত্তম উপায়। মান ভাঙ্গিবার এ কৌশল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। গীতগোবিন্দে শ্যামসুন্দর স্পষ্ট কথায় শ্রীমতীর উদার পাদবল্লব মস্তকে ধারণের প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু কবি চণ্ডীদাস অতি সুচারু কৌশলে নাগরকে পায়ে ধরাইয়া মান ভাঙ্গিলেন—এ রস অতি চমৎকার। এভাবের তুলনা নাই। ইহাতে আরও সৌন্দর্য্য এই যে শ্রীমতীর অলক্ত-রঞ্জিত শ্রীচরণের ধারে ধারে রসময় প্রেমময় শ্যামসুন্দর নিজের নাম লিখিয়া দিয়া চিরদিনের তরে শ্রীমতীর চরণদাসত্বের দলিল

লিখিয়া দিলেন। এই চমৎকার সৌন্দর্য্যময় প্রেম-ভাবরসের তুলনা হয় না —অতি সুন্দর—অতি মধুর—অতি চমৎকার।

এইরূপে শ্রীমতীর দুর্জ্জয় মান প্রশমিত হইল। তৎপরে স্বরূপ আবার শ্রীমতীর উক্তিতে মিলন-আনন্দের পদ ধরিলেন ঃ—

ছি ছি দারুণ মানের লাগিয়া
বন্ধুরে হারায়ে ছিলাম।
শ্যাম সুন্দর রূপ মনোহর
দেখিয়া পরাণ পেলাম॥
সই জুড়াইল মোর হিয়া।
শ্যাম অঙ্গের শীতল পবন
তাহার পরশ পাইঞা॥
তোরা সখীগণ করহ সিনান
আসিয়া যমুনার নীরে।
আমার বন্ধুর যত অমঙ্গল
সকল যাউক দূরে॥
শ্রীমধু মঙ্গলে আনহে সকলে
ভুঞ্জাও পায়স দধি।
বন্ধুর বাথানে দেহ নানা দানে
আমারে সদয় বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস শুনহে নাগর
এমন উচিত নয়।
না দেখিলে যুগ শতেক মানয়
ইথে কি পরাণ রয়॥

এই মিলনের পদ শুনিয়া সকলেই আহ্লাদিত হইলেন এবং শ্রীশ্রীরাধা

গোবিন্দের জয় দিয়া আনন্দে মগ্ন হইলেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রণত হইলেন, তৎপরে শ্রীরামরায়ের ও শ্রীপাদ স্বরূপের চরণধূলি মাথায় লইয়া ধ্যানমগ্নের ন্যায় মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিতে লাগিলেন।

আক্ষেপ অনুরাগ

বেদান্তীরা বলেন মায়ার দুই শক্তি—আবরিকা ও আক্ষেপিকা। অবিদ্যা বা মায়া, আবরিকা শক্তি দ্বারা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সংগোপন করে এবং বিক্ষেপিকা শক্তি দ্বারা অনাত্ম বস্তুতে আত্মজ্ঞান ঘটায়। সকল শ্রেণীর বেদান্তীরাই ইহা স্বীকার করেন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত বেদান্তীরাও এই সিদ্ধান্ত মানেন। প্রকৃত মতভেদ হয়—জীবের স্বরূপবিচার লইয়া। মায়াবাদীরা বলেন জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই নহেন। কিন্তু বৈষ্ণব বেদান্তীরা বলেন জীব বিভু নহে—অণু। জীব এক নহে—অনেক। শ্রীচরিতামৃত পাঠে বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক সিদ্ধান্তের উল্লেখ দেখিতে পান। জীব যে অণু ও অনেক ইহা সর্ব্ব বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই গ্রাহ্য। পরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি মহোদয় বলেন জীব পরমাত্মার অংশ; সূর্য্যের সহিত তাহার রশ্মি সমূহের যে সম্বন্ধ, পরমাত্মার সহিত জীবগণের সেই সম্বন্ধ। পরমাত্মা চিৎসিন্ধু—জীব চিদ্‌বিন্দু; পরমাত্মা প্রেমসিন্ধু—জীব প্রেমবিন্দু। প্রেমসিন্ধুর সহিত প্রেম-বিন্দুর মিলন-প্রয়াস স্বাভাবিক। জীবের বিশুদ্ধ অবস্থার ইহাই আকাঙ্ক্ষা। অবিদ্যার আবরিকা ও বিক্ষেপিকা শক্তি হইতে বিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জীবের এই আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টতঃই পরিলক্ষিত হয়। গোপীভাবে এই তথ্য পরিস্ফুট হয়। মহাজনগণের মাধুর্য্য-রসের পদাবলীতে এই ভাবের অভিব্যক্তি পরিদৃষ্ট হয়। এই সরস সুন্দর

সমুজ্জ্বল সুমধুর বিশুদ্ধ জীবস্বরূপের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই গোপীভাবের আনুগত্যে মানুষের উপাসনার লক্ষ্য স্থিরীকৃত হয়। বঙ্গীয় গোস্বামি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই ভাব-রস-প্রকর্ষ অনুসরণ করিয়াই গোপীভাব-রসামৃত-লহরীর কলকল্লোলে নিমগ্ন হন। শ্রীশ্রীগৌরগম্ভীরা-মন্দিরে ইহারই উচ্চতম আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীপাদ রায় রামানন্দ প্রভৃতি শ্রোতা এবং মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ গান্ধর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ রসবেদান্ত-পারদর্শী যতীন্দ্রচূড়ামণি শ্রীপাদস্বরূপ-দামোদর—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলারসময় পদাবলী-গায়ক। আমরা শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের সেই রসময়-গম্ভীরা লীলায় লীলাগান-রসাস্বাদনের বিন্দুমাত্র স্মরণার্থ নীলাচলে ব্রজমাধুরীর ধারায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থেও যৎকিঞ্চিৎ প্রয়াস পাইয়াছি।

এই পুস্তিকায় সর্ব্বত্র কোন ক্রমে স্থির রাখিতে পারি নাই। চিত্তের আবেগে যখন যে পদটীতে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে সেই পদটীরই আলোচনা করিয়াছি। এখন আক্ষেপানুরাগের কয়েকটী পদের আস্বাদনের প্রয়াস পাইতেছি। ইহার দুই একটা পদ পূর্ব্বেও আলোচিত হইয়াছে। আক্ষেপানুরাগের পদেও জ্বালামালার নিদারুণ আতিশয্যই অনুভূত হয়। বিশেষতঃ শ্রীপাদ চণ্ডীদাসঠাকুরের এই বিষয়ক পদগুলি অতি প্রগাঢ় ভাবরসাত্মক এবং সর্ব্বদাই চির নূতনবৎ প্রতিভাত হয়।

মনে প্রাণে জ্ঞানে ভাবে বুদ্ধিতে অবশেষে আত্মায় আত্মায় এক করিয়া তোলাই প্রকৃত প্রেমের কার্য্য। আরও শুনুন ঃ—

কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি॥

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
কোন বিধি সিরজিল সোতের সেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
চণ্ডীদাস বলে এই বাশুলী কৃপায়।
এমন পিরীতি আমি না দেখি কোথায়॥

আক্ষেপ অনুরাগের পদগুলির কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টি শুনাইব? মনে হয় অনন্ত বদনে চণ্ডীদাসের পদগুলি প্রভুর সমক্ষে গান করি। আরও দু' একটি গাইতেছি :—

কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পিরীতি ঝুরি দিবারাতি
সদায় চমকে চিত॥
সই ছাড়িতে নারি যে কালা।
কুল তেয়াগিয়া ধরম ছাড়িয়া
লইব কলঙ্ক ডালা॥
মাথায় করিয়া দেশে দেশে ফিরি
মাগিয়া খাইব তবে।
সতী চরচায় কুলের বিচার
তবে সে আমার যাবে॥
চণ্ডীদাস কয় কলঙ্কের কি ভয়
যে জন পিরীতি করে।

পিরীতি লাগিয়া মরমে ঝুরয়ে
কি তার আপন পরে ॥

এই ভাবের আরও একটি পদ এই যে :—

জাতি জীবন ধন কালা।
তোমরা আমারে যে বল সে বল
কালিয়া গলার মালা ॥
সই ছাড়িতে নারিব তারে।
অন্তর সহিত সে প্রেম জড়িত
কে তারে ছাড়িতে পারে ॥
যেদিন যেখানে যেই সব লীলা
করিত কালিয়া কানু।
সঙ্গের সঙ্গিনী হইয়া রহিনু
শুনিতাম মৃদু বেণু ॥
এতরূপে নহে হিয়া পরতীত
যেতাম কদম্বতলা।
চণ্ডীদাস কহে এত প্রাণে সহে
বিষম বিষের জ্বালা ॥

শ্রীরাধা-প্রেমের একটী প্রধান লক্ষণ—অত্যন্ত দৃঢ়তা। এই দৃঢ়তা শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের পদাবলীতে যেরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে, আর কুত্রাপি সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ সাধন-নিষ্ঠায় এই দৃঢ়তাই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির পরম সহায়। শ্রীমতী বলিতেছেন :—

বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যতজন।
ছাড়িতে নারিব আমি শ্যাম চিকণধন ॥

সেরূপ লাবণি মোর হিয়ায় লাগিয়াছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটি লইয়া যায় পাছে ॥
সখি এই ভয় মনে বড় রাখি।
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবানিশি ॥
অলসে আইসে নিদ যদি দুইটি আখে।
শয়ন করিয়া থাকি ভূজ দিয়া কাঁখে ॥
এমন পিয়ারে মোর ছাড়িতে লোকে বলে।
তোমরা বলিবে যদি খাইব গরলে ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সকল পদ শুনিয়া অতীব আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহার প্রীতির জন্য শ্রীপাদস্বরূপ গাইতে আরম্ভ করিলেন :—

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদরায়।
তোমা বিনা মোর চিতে কিছুই না ভায় ॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি ॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া ॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ, আখি ভরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল ॥
নিশি দিশি তোমায় বন্ধু পাশরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়া রাখ স্থির করি ॥

প্রেমের এই উচ্চতম ভাব নরলোকে সম্ভবপর নহে। নরনারীগণের মধ্যে কখন কখন প্রেমের নিঃস্বার্থ উচ্চভাব দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহা অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী এবং একটুকু তলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে তাহাও একবারে স্বার্থ-সংস্রবলেশ-পরিশূন্য নয়। গান শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন

স্বরূপ, এই প্রেম-প্রবাহ একবারেই মহাযোগীর ধ্যানের ন্যায় একতানময়। শ্রীমতী বলিতেছেন শ্যামসুন্দর আমি তোমার প্রেমে চিরতরে বন্দী হইয়াছি, তোমার ভাবনা বিনা এ হৃদয়ে আর কোনও ভাবনা স্থান পায় না, শয়নে স্বপনে কেবলই তোমার ভাবনা, এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তোমা ভিন্ন আর কিছুই আমার ভাল লাগে না। দিবানিশি কেবল তোমার জন্যই এ হৃদয় বিকল থাকে।" এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া শ্রীশ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণ চিন্তা করিয়া প্রেমিক ভক্তগণকে ভজনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। শ্রীপাদ চণ্ডীদাসঠাকুর ব্রজরসের সিদ্ধ কবি।

শ্রীপাদস্বরূপ বলিলেন প্রভো শ্রীরাধার প্রকৃত আক্ষেপের একটি পদ পাইতেছি :—

যখন নাগর পিরীতি করিলা
সুখের না ছিল ওর।
এবে সোতের সেওলা ভাসাইয়া কালা
কাটিলা প্রেমের ডোর॥
মুইতো অবলা অখলা হৃদয়
ভালমন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে আঁকিয়া
বিশাখা দেখালো আনি॥
পিরীতি মূরতি কোথা তার স্থিতি
বিবরণ কহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
এত পরমাদ করে॥
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে!

অমৃত বলিয়া গরল ভখিনু
বিষেতে জারল দে॥
নদীর উপরে জলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে রসিক বসতি
পিরীতি না জানে কেউ॥
চণ্ডীদাস কয় দুই এক হয়
তবে সে পিরীতি রয়।
খলের পিরীতি তুষের অনল
ধিক্ ধিক্ যেন বয়॥

শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ঠাকুরই প্রকৃত প্রেমের মর্ম্ম জানিতেন। সাধারণ লোকেরা এ হেন প্রেমের মর্ম্মই বুঝিতে পারে না। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ—নরকের দ্বার। তাহাতে কখনও এক নিষ্ঠা থাকিতে পারে না। সাধারণী ইন্দ্রিয়পরায়ণা কুলটা স্ত্রীলোকগুলি অনেক সময়ে মুখে এইরূপ দৃঢ়তার কথা জানাইয়া পুরুষকে আয়ত্তে রাখিতে চেষ্টা পায়, সেই সকল পাপীয়সী রাক্ষসী প্রকৃতির নারীগণই এহেন নির্ম্মল প্রেমের অস্তিত্বে সন্দেহ জন্মাইয়া দেয়। ফলতঃ এই জগতে প্রেমের নামে যে জঘন্য ইন্দ্রিয়পরায়ণতার আদান প্রদান চলিতেছে, তাহাতে প্রকৃত প্রেমের ধারণা হওয়াই অসম্ভব। শ্রীপাদ চণ্ডীদাস এই ভাবের বহুল পদাবলীর দ্বারা নারী হৃদয়ের ব্রজ প্রেমের প্রকৃত চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীরাধার আক্ষেপানুরাগের একটী সুন্দর পদ এই :—

সুজন কুজন যে জন না জানে
তাহারে বলিব কি।

অন্তর বেদনা যে জন জানয়ে
পরাণ কাটিয়া দি ॥
সই কহিতে বাসি সে ডর।
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
সে কেন বাসয়ে পর॥
কানুর পিরীতি বলিতে বলিতে
পাঁজর ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খ বণিকের করাত যেমতি
আসিতে যাইতে কাটে॥
সোণার গাগরি যেন বিষ ভরি
দুধেতে ভরিয়া মুখ।
বিচার করিয়া যে জন না খায়
পরিণামে পায় দুখ॥
চণ্ডীদাস কয় শুনহ সুন্দরী
একথা বুঝিবে পাছে।
শ্যাম-বঁধু সনে পিরীতি করিয়া
কেবা কোথা ভাল আছে॥

আক্ষেপানুরাগের পদগুলির মধ্যে কোনটি ছাড়িয়া কোনটি ধরিব, আরও শুনুন :—

পিয়ার পিরীতি লাগি যোগিনী হইনু।
তবুতো দারুণ চিতে সোয়াস্তি না পাইনু॥
কি হলো কলঙ্ক রব শুনি যথাতথা।
কেনবা পিরীতি কৈনু খাইনু আপন মাথা॥

না বল না বল সই সে কানুর গুণ।
হাতের কালি গালে দিলে মাথে কালি চুণ॥
আর না করিব পাপ পিরীতির লেহা।
পোড়া কাড় সমান করিনু নিজ দেহা॥
বিধির কি দিব দোষ করম আপনা।
সুজনে করিনু প্রেম হইল কুজনা॥
চণ্ডীদাস কয় তুমি না কর ভাবনা।
সুজনে সুজন মিল কুজনে কুজনা॥

এইরূপ আরও একটি পদ এই :—

এক জ্বালা ঘরে হৈল আর জ্বালা কানু।
জ্বালাতে জ্বলিল চিত সারা হৈল তনু॥
কোথাকারে যাব সই কি হবে উপায়।
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায়॥
কাহারে কহিব আমি কে যাবে প্রতীত।
মরণ অধিক ভেল কানুর পিরীত॥
আরলেক তনু মন কি করে ঔষধে।
জগত ভরিল এই কানু পরিবাদে॥
লোক মাঝে ঠাঞি নাই অপযশ দেখে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন,—দয়াময়, আপনার কৃপায়, আপনার শ্রীচরণ-তলে বসিয়া শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ঠাকুরের পদাবলী যখন গান করি, তখন আপনার শ্রীমুখপঙ্কজ দর্শন মাত্রেই শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীশ্রীরাধারাণীর শ্রীমুখারবিন্দ আমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়; সেই ঢল ঢল সরল সজল নয়নে শ্রীরাধার ভাবসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া আমি যে শক্তি লাভ করি, তাহা ভাষায়

নিবেদন করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারি না। আপনি সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি, আপনি সকলই জানেন! সেদিন শ্রীরূপ বলিয়াছিলেন যে, সর্ব্বদাই আপনি পদাবলী গান করিয়া থাকেন, ইহাতে কি আপনার ক্লান্তি হয় না? প্রকৃত কথা বলিতে কি যখন পদাবলী গান করিতে না পাই, দয়াময় প্রভু যখন ভাবে বিভোর থাকেন, তখন পদাবলী গাহিতে না পারিয়া আমার যে অবস্থা ঘটে তাহাই ক্লান্তির অবস্থা। মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন, তাহা হইলে স্বরূপ নিরব থাকার প্রয়োজন নাই; আক্ষেপানুরাগে যেরূপ পদগান করিতেছিলে, সেইরূপ আরও দুই একটী পদ শ্রীরূপকে শুনাও।

তখন স্বরূপ অতি উৎসাহে পদ ধরিলেন,—

গোকুল নগরে আমার বঁধুরে
সবাই আপনা বাসে।
হাম অভাগিনী আপন বলিলে
দারুণ লোকেতে হাসে॥
সই, কি জানি কি হৈল মোরে।
আপনা বলিয়া দুকুল চাহিয়া
না দেখি দোসর পরে॥
কুলের কামিনী হাম একাকিনী
না দেখি দোসর জনা।
রসিক নাগর গুরু জন বৈরী
এ বড় মুরখ পনা॥
বিধির বিধান এমন করণ
বুঝহু করম দোষে।
আগেতে বুঝিয়া না কৈল সুঝিয়া
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

আরও শুনুন :—

পিরীতি লাগিয়া আমি সব তেয়াগিনু।
তবু তো শ্যামের সনে গোঙাতে নারিনু॥
বিধিরে কি দিব দোষ—আপন করম।
কি ক্ষণে করিনু প্রেম না জানি মরম॥
ঘরে পরে বাহিরে কুলটা হলো খ্যাতি।
কানু সনে প্রেম করি না পোহাল রাতি॥
চল চল আলো সই ওঝার বাড়ী যাই।
কাল কূট বিষ আনি তাকে তুলি খাই॥
পিরীতে মরিতে লাগি যেবা করে আশ।
পিরীতি লাগিয়া মরে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

মহাপ্রভু বলিলেন স্বরূপ—আমি তোমার নিকট যে অমৃতের আস্বাদ পাইয়া জীবন ধারণ করিতেছি, শ্রীরূপকে সে রসাস্বাদন না করাইয়া আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না। তুমি "কেমনে ধরিব হিয়া" সেই পদটী আবার গাও শুনি।

স্বরূপ গাইতে আরম্ভ করিলেন :—

সই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে।
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমতি হউক সে॥

যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোক অপযশ কয়।
সেই গুণ নিধি ছাড়িয়া পীরিতি
আর জানি কার হয়॥
আপনা আপনি মন বুঝাইতে
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ হরণ করিলে
কাহার পরাণে সয়॥
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে।
আমার পরাণ যেমতি করিছে
সেমতি হউক সে॥
কহে চণ্ডীদাস করহ বিশ্বাস
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল আছয়ে সুন্দরী
দিয়া পরমনে দুখে॥

মহাপ্রভু বলিলেন "স্বরূপ, ব্রজপ্রেমিকার হৃদয়ে এই যে সংশয়—ইহাই এক বিষম জ্বালা, প্রেম প্রতিযোগিতা সহিতে জানে না, ভাগ বিভাগ জানে না, ষোল আনা নিজের আয়ত্ত করিতে চাহে; ইহাতে ঔদার্য্যের অভাব আসিতে পারে, কিন্তু তাহা ব্যতীত প্রেমের নিষ্ঠাভঙ্গো হয় না, আচ্ছা স্বরূপ, তাহার পরে শ্রীমতী কি বলিলেন?

স্বরূপ বলিলেন তবে শুনুন"—

দেখিব যে দিনে আপন নয়নে
কহিতে তা সনে কথা।

কেশ দূর করি বেশ ঘুচাইব
মুড়িব আপন মাথা ॥
সই কেমনে ধরিব হিয়া ।
এমত সাধের বঁধুয়া আমার
দেখিতে না চায় ফিরিয়া ॥
সে হেন কালিয়া যাচিলেক হিয়া
এমতি করিল কে ।
হৃদয় সাদতি আমার যেমতি
তেমনি পুড়ুক সে ॥
কহে চণ্ডীদাস কেন কর ত্রাস
সে ধন তোমারি বটে ।
তার মুখে ছাই দিয়া সে কানাই
আসিবে তোমা নিকটে ॥

প্রেমের এই এক ভাব। শ্রীরাধার এই ভাবের উক্তিতে কেহ কেহ অনৌদার্য্যের আশঙ্কা করেন। তাঁহারা বলেন অন্যে কে কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে ভাল বাসেন বলিতে পারি না, কিন্তু কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিকটে আবদ্ধ রাখিতে ভাল বাসেন, কিন্তু শ্রীমতী রাধার প্রেমের উচ্চতম প্রবাহে সে চিন্তা একবারেই স্থান পায় না। শ্রীমতী রাধার কোন উক্তিতেও তাহা জানা যায়। যথা:—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাং
অদর্শনাৎ মর্ম্মহতাং করোতু বা
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটঃ
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।

আমি কৃষ্ণ পদদাসী তিঁহো রস সুধারাশি
আলিঙ্গিয়ে করুন আত্মসাৎ।
কিবা না দিয়ে দরশন জারেন আমার তনু মন
তবু তিঁহো মোর প্রাণ নাথ॥
সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে কিবা দুঃখ দিয়া মারে
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ,—অন্য নয়॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ মোর বশ তনু মন
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সবারে দেন পীড়া আমা সনে করি ক্রীড়া
সেই নারীগণে দেখাইয়া॥
কিবা তিঁহো লম্পট শঠ ধৃষ্ট সুকপট
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া মোর আগে করে ক্রীড়া
তবু তিঁহি মোর প্রাণ নাথ॥
না গণি আপনি দুঃখ সবে বাঞ্ছি তার সুখ
তার সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুখ তার হয় মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ তাঁর রূপে সতৃষ্ণ
তারে না পেয়ে হয় দুঃখী।
মুঞি তাঁর পায়ে পড়ি লয়ে যাও হাতে ধরি
ক্রীড়া করাইয়া করোঁ সুখী॥

অতি বিশুদ্ধ প্রেমের এই এক উচ্চতম ভাব। অন্যাসঙ্গম অসহিষ্ণুতা-

নারীমাত্রেরই হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের প্রাগুক্ত পদে সেই স্বাভাবিক ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেমের উক্তভাব এজগতের নারী-হৃদয়েও অনুক্ষণই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রেমের যে প্রবাহে আত্মসুখ বাঞ্ছার লেশ মাত্রও দৃষ্ট হয় না, কেবল কৃষ্ণসুখই যে প্রেমের এক মাত্র তাৎপর্য্য, প্রেমের সেই ভাব যে প্রকৃতই অপার্থিব—একেবারেই এজগৎ ছাড়া এবং উহা যে অতীব উচ্চতম রাজ্যের ভাব, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রেমলীলায় উহার মাধুর্য্য কি পরিমাণে আস্বাদিত হয় তাহা বলা যায় না। নায়কই বা তাদৃশী প্রেমিকার প্রেমরস কি পরিমাণে আস্বাদন করেন তাহাও বিবেচ্য। উহা নিরুপাধি প্রেমের আদর্শ বটে, বেদান্তীদের অনুভবের উচ্চতম রাজ্যেও উহার আসন নির্দ্দিষ্ট বটে, কিন্তু প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে প্রেম তরঙ্গায়িত হয় না, বিকৃত বা বিচলিত হয় না, কোনও প্রকারে আত্ম প্রকাশ করে না। তাঁহার স্বরূপানুভবে রসাস্বাদন লীলা-ব্যাপারে বড় সহজ নহে। আমরা চণ্ডীদাসের বর্ণিত এই ভাবটীর রসাস্বাদনে প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার হৃদয়ের প্রেম-তরঙ্গাভিঘাতের বিশালতা সহজেই অনুভব করিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধার হৃদয়ের যে জ্বালাময়ীর উৎকট তাপাতিশয্য অনুভূত হয় নিজ হৃদয়ে তাহার কতকটা অনুভব করিয়া তাহার ব্যাথায় ব্যথিত হই। কিন্তু বেদান্তের ঐ নিষ্কাম নির্ব্বিকার নিরস প্রেমের উচ্চতমতায় উহার বিশাল গাম্ভীর্য্য এবং অবিচলিত প্রশান্ত স্থৈর্য্যে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেও উহার জন্য হৃদয় কান্দিয়া ব্যাকুল হয় না, নয়নে একবিন্দু অশ্রুর কণাও দেখা দেয় না।

নারীপ্রেমে অন্যাসঙ্গ-অসহিষ্ণুতা—প্রেম নিষ্ঠারই পরিচায়ক এবং উহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের প্রেমবর্ণনায় সর্ব্বত্র অতি সুন্দর স্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত। যাঁহাদের হৃদয়ে এই ব্রজরস-মাধুর্য্যের কণা-

মাত্রও বিরাজমান, তাঁহারা এই পদাবলী পাঠে স্থির থাকিতে পারে না। পাঠ বা শ্রবণ মাত্রেরই হৃদয়ের প্রসুপ্ত ভাব জাগিয়া উঠে, চিত্ত ব্যাকুল হয়, আত্মার নিভৃত গূঢ়তম স্তরের সনাতনী সুপ্রাচীনা মধুময়ী কৃষ্ণপ্রেমের স্মৃতি—বর্ষার নব প্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। শ্রীগৌর-গম্ভীরার এই নিত্য আস্বাদ্য রসসুধা সাধারণ নরনারীগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা সুসঙ্গত কিনা তাহাও বিবেচ্য। কিন্তু ইহাও অতি সত্য যে শ্রীগম্ভীরামন্দিরের গভীর ভাবের মধ্য দিয়া এ লীলায় প্রবেশ ভিন্ন উহাতে প্রবেশের আর দ্বিতীয় পথও দেখা যায় না। যাঁহারা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির অমিয় মধুর ব্রজরসময়ী প্রেমলীলার আস্বাদন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের প্রতি আমাদের এই নিবেদন তাঁহারা যেন মানবীয় ভাব হৃদয়ে লইয়া যুবক যুবতীর প্রেমানুরাগের ভাব হৃদয়ে মাখিয়া এই সকল পদ-রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত না হন। এই পদাবলীর আস্বাদন করিতে হইলে গম্ভীরা মন্দিরের প্রেম-রসাত্মা যতীন্দ্রচূড়ামণিগণের শ্রীমূর্ত্তি হৃদয়-পটে অধিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদের ভাবরসের লেশাভাসে বিভাবিত হইয়া যদি এই পদাবলীর আস্বাদনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে শ্রীশ্রীপ্রভুগণের কৃপায় প্রকৃত রস হৃদয়ে সমুচ্ছ্বসিত হইবে—প্রেমরসমাধুর্য্যে আত্মা ব্রজভাবের আস্বাদনে কৃতার্থ হইবে।

শ্রীগম্ভীরামন্দিরেই এই রসের নিত্য আস্বাদন। প্রেমানন্দরস-বিগ্রহ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও প্রেমমূর্ত্তি সন্ন্যাসী শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীপাদ রামরায়ের নিত্য আস্বাদ্য বস্তু অবশ্যই ভক্ত নরনারীগণের পরম কল্যাণ সাধন করিবে। সুতরাং ইহা পাঠ ও শ্রবণ ভক্তগণের পক্ষে যে পরম রসায়ন হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

এক দিন স্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিলেন প্রভো শ্যামসুন্দরের প্রেমে শ্রীমতী এমনই অরজা হইয়া ছিলেন যে ইহার জ্বালায় তিনি একবারে অস্থির হইয়া বলিলেন :—

সখি কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনি
পাপ-পিরীতির কথা॥
সই কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল॥
কুলবতী হৈয়া কুলে দাঁড়াইয়া
যে জন পিরীতি করে।
তুষের অনল সে জন সাজাইয়ে
এমতি পুড়িয়া মরে॥
হাম অভাগিনী জনম দুখিনী
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে যেমতি হইল
পরাণ সংশয় দেখি॥

আরও একটি সুবিখ্যাত পদ গাইতেছি—

সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া সো চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।

লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল
মাণিক হারানু হেলে ॥
নগর বসালেম সাগর সেচিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম দোষে ॥
পিয়ার লাগিয়া জলদে সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যামের পিরীতি
মরমে হানিল শেল ॥

এই সহজ সরল সরস পদ বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে গীত হয়, এটি প্রায় সকলের কণ্ঠে কণ্ঠে বিরাজিত। সরল ভাষায় সহজ কথায় গভীর মর্ম্মভেদী ভাব এই পদে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। এই একটি মাত্র পদই চণ্ডীদাস ঠাকুরকে পদাবলী সাহিত্যের শিখরদেশে সমারূঢ় করিয়া রাখিবার যোগ্য। প্রেমময়ী শ্রীরাধার প্রাণের ভাষা বোধ হয় কেবল একমাত্র চণ্ডীদাসের পদাবলীতেই কতকটা প্রকৃত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমতী বলিতেছেন :—

আপনা আপনি দিবস রজনী
ভাবিয়ে কতেক দুখ।
যদি পাখা পাই, পাখী হয়ে যাই
না দেখাই পাপমুখ ॥
সই বিধি দিল মোর শোক।
পিরীতি করিয়া আশা না পুরিল
কলঙ্ক ঘুষিল লোক ॥

হাম অভাগিনী তাতে একাকিনী
নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে যত বলে মোকে
তাহাও না যায় শুনা॥
যদি এ সময়ে মরণ হইত
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাস কয় এমতি হইলে
পিরীতির কিবা সুখ॥

পূর্ণ স্বাধীনতাতেই প্রেমের বিকাশ। কিন্তু শ্রীরাধার প্রেমে স্বাধীনতা নাই। বিবিধ বাধা বিঘ্ন তাড়না যাতনার ভিতর দিয়া এই প্রেম বিকাশ লাভ করে তথাপি ইহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। যদি বাধা না থাকিত, ঘাত প্রতি ঘাতে মর্ম্ম বেদনা না বাড়িত,—শ্রীরাধা প্রেমের এরূপ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য পরিলক্ষিত হইত না, সাধকগণ ও সিদ্ধগণ এই প্রেমকে আদর্শ প্রেম বলিয়াও গণ্য করিতেন না। অনন্ত প্রতিবন্ধকতার পাষাণ বাঁধ বিদীর্ণ করিয়া এই প্রেম শ্যামসিন্ধুর অভিমুখে প্রধাবিত হইয়া অবশেষে সেই অনন্ত প্রেমসিন্ধু তরঙ্গে ইহা আত্ম বিসর্জ্জন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। কোন বাধাতেই ইহার গতি রোধ করিতে পারে নাই। যে প্রেম নির্ব্বাধে আপন ইষ্ট বস্তু লাভ করে, তাহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না, উহার শক্তি সামর্থ্য ও নিষ্ঠানৈপুণ্য-বিকাশের উপায় অবসরও ঘটে না। শ্রীমতী বলিতেছেন :—

পরের অধীনী ঘুচিবে কখনি
এমতি করিবে ধাতা।
গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
না শুনি পিরীতি কথা॥

সই যে বল সে বল মোরে।
শপথি করিয়া বলি দাঁড়াইয়া
না রব এ পাপ ঘরে॥
গুরুর গঞ্জন মেঘের গর্জ্জন
কত বা সহিব প্রাণে।
ঘর তেয়াগিয়া যাইব চলিয়া
রহিব গহন বনে॥
বনেতে রহিব শুনিতে না পাব
এ পাপ জনার কথা।
গঞ্জনা ঘুচিবে হিয়া জুড়াইবে
যাইবে অন্তরের ব্যথা॥
চণ্ডীদাস কয় স্বতন্ত্রী হয়
তবে সে এমন বটে।
যে সব কাহিলে করিতে পারিলে
তবে সে এ তাপ ছুটে॥

কিন্তু শ্রীরাধা মনে মনে গৃহ-ত্যাগিনী হইলেও কার্য্যতঃ তাহা করেন নাই, বোধ হয় সেরূপ হইলে প্রেমের এ মাধুর্য্য থাকিত না। সহজ লভ্য বস্তুর মূল্য বড় কম। দুর্ল্লভ দুষ্প্রাপ্য বস্তুতেই তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে—সেই আকাঙ্ক্ষাই দিন দিন বলবতী হইয়া উঠে। এই জন্যই পরকীয়া ভাবের আবরণে সংরক্ষিত হইয়া শ্রীরাধা-প্রেমের মাহাত্ম্য যোগী ঋষি-গণেরও কীর্ত্তিতব্য ও পরমধ্যেয়রূপে গণ্য হইয়াছে। উহাতেই আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে। শত সহস্র প্রতিবন্ধকতাতেও উহার গতিরোধ করিতে পারে নাই, প্রত্যুত বাধার ঘাত-প্রতিঘাতে উহা প্রতিমুহূর্ত্তেই অদম্য শক্তি সঞ্চয় করার সুবিধা পাইয়াছে, অথচ মর্ম্মদাহী

জ্বালায় উহা ভস্মীভূত না হইয়া অনুক্ষণই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা :—

দিবস রজনী গুণি গুণি গুণি
কি হলো অন্তর ব্যথা।
খলের বচনে পাতিয়ে শ্রবণে
খাইনু আপন মাথা॥
কে বলে পিরীতি ভাল গো সখি
কে বলে পিরীতি ভাল।
সে ছার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
অন্তর জ্বলিয়া গেল॥
বিষের গাগরী ক্ষীর মুখে ভরি
কেবা আনি দিল আগে।
করিনু আহার না করি বিচার
এ বধ কাহার লাগে॥
নীর লোভে মৃগী আনন্দে ধাইতে
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের সফরী আহার করিতে
বড়শী লাগল মুখে॥
নব ঘন হোর পিয়াসে চাতকী
চঞ্চু বাড়াল আশে।
বারিক বারণ করিল পবন
কুলিশ মিলন শেষে॥
ক্ষীর নাড়ু করি বিষে মিশাইয়া
অবলা বালাকে দিল।

সুস্বাদ পাইয়া খাইতে খাইতে
নিকটে মরণ ভেল॥
লাখ হেম পেয়ে যতনে বাঁধিতে
পড়িল অগাধ জলে॥
হেন অনুচিত করে পাপ বিধি
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে॥

ইহার প্রত্যেকটি উপমাই হৃদয় স্পর্শী, শুধু স্পর্শী নহে, একবারেই মর্ম্মদাহী। এ যাতনা যার হয়, কেবল সেই ইহার পরাক্রম জানে, অন্যে তাহা জানে না, বুঝিতেও পারে না। নিভৃত নির্জ্জনে বসিয়া আপন প্রাণে ঝুরিয়া ঝুরিয়া এ যাতনা ভোগ করিতে হয়, অথচ উহা ত্যাগ করিতেও প্রাণ চায় না। তাই শ্রীমতী বলিতেছে :—

সই বড়ই প্রমাদ দেখি
কানুর সনেতে পিরীতি করিয়া
নিরবধি ঝুরে আঁখি॥
কাহারে কহিব মনের আগুন
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে।
যেমন কুঞ্জর বাউল হইলে
অঙ্কুশ ভাঙ্গিয়া ছুটে॥
কিসে নিবারিব নিবারিতে নারি
বিষম হইল লেঠা।
হেন মনে করি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদি
গুরুজন হলো কাঁটা॥
যাইয়া নিভৃতে বসি একভিতে
সদা ভাবি কালা কানু।

বিরলে বসিয়া ঝুরিতে ঝুরিতে
কবে বা ত্যজিব তনু ॥
ধীবর দেখিয়া জলে যত মীন
যেমন তরাসে কাঁপে ।
আমার তেমতি ঘরের বসতি
গরজি গরজি ঝাঁপে ॥
ঘরে গুরুজন বলে কুবচন
যদি বা সহিতে পারি ।
যাহার লাগিয়া এতেক সহিছি
সে আছে ধৈরজ ধরি ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনী
সকলি স্বপন মানি ।
তুমি কালিয়ার, কালিয়া তোমার
জগতে সবাই জানি ॥

(বিশুদ্ধ প্রেমের এতাদৃশ অনুভব যে অতি সত্য এই দীনাতিদীন লেখক শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের কৃপায় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। ব্রজপ্রেমরস-সিন্ধুর ক্ষুদ্রতম দুই এক বিন্দু এই ভজনাভাব-নিদাঘ-তপ্ত সংসার-মরুতেও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের কৃপা-ফলে সময়ে সময়ে ছিটকাইয়া পড়ে; সুপবিত্র সুবিশুদ্ধ প্রেম-ভক্তির লেশাভাস-প্রাপ্ত রমণী-হৃদয়ে কচিৎ কচিৎ এই ভাব দৃষ্ট হয়। এই ভাবের এক দেবীপ্রতিমা আমি নিজেও প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। যদি তাঁহার পবিত্রতামাখা পুণ্যময়ী মূর্ত্তির দর্শন না পাইতাম, তবে এই সকল জ্বালামালাময়ী পদ-গীতির ভাব-রসের যথার্থতা ও প্রকৃত সৌন্দর্য্য কোনক্রমেও অনুভবে আনিতে

পারিতাম না। সেই বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির শ্রীমূর্ত্তি এ জগতে আর কয়দিন প্রকট থাকিবেন বলিতে পারি না। ইনি এমনই নিভৃত ভাবে বিপ্রলম্ভ-ময় জীবন যাপন করিতেছেন যে, সংসারের কাহারও নিকট ইহার অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত নহে। সময়ে ভক্ত সমাজে ইনি প্রকটিতা হইবেন বলিয়াও আশা নাই। কিন্তু ইনি যে শ্রীশ্রীরাধারাণীর যূথের কোন চিহ্নিতা মঞ্জুরী, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি কখনও সুবিধা হয়, অতঃপরে ইঁহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইবে।)

স্বরূপ বলিলেন প্রভো, শ্রীরাধার হৃদয়ে সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় আক্ষেপঅনুরাগের তরঙ্গ দিবানিশি প্রবাহিত হয়। শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের লেখনী শ্রীরাধার কৃপাশক্তি-চালিত। উহার ফলে শ্রীরাধার ভাবরস ময় উচ্ছ্বাস সর্ব্বদাই এই সকল পদে পরিলক্ষিত হয়। আর একটি পদ শুনুন, সম্ভবতঃ এই পদ আরও কোনও সময়ে আপনার নিকট গাইয়া ছিলাম। কিন্তু শ্রীল রূপ তখন এখানে ছিলেন না। এপদটীও শ্রীরূপের ভাল লাগিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। শ্রীরূপ বলিলেন, উহা আমার সৌভাগ্য। স্বরূপ তখন গাইতে লাগিলেন—

কি হলো কি হলো মোর কানুর পীরিতি।
আঁখি ঝোরে হায় হায় প্রাণ কাঁদে নিতি॥
শুইলে সোয়াস্তি নাই নিদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
নবীন পাউসের মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে প্রাণ ধৈরজ না মানে॥
এনা রস যে না জানে, সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে বিঁধিল মোর কানু প্রেম শেল॥

নিগূঢ় পিরীতি থানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস সদা হয় যে ফাঁপর॥

আরও শুনুন ঃ—

জনম গোঙানু দুখে কত বা সহিব বুকে
কানু কানু করি কত নিশা পোহাইব।
অন্তরে রহল ব্যথা কূল শীল গেল কোথা
কানু লাগি গরল ভক্ষিব॥
কুলে দিনু তিলাঞ্জলি গুরু-দিঠে দিনু বালি
কানু লাগি এমতি করিনু।
ছাড়িনু গৃহের সাধ কানু কৈল পরিবাদ
তাহার উচিত ফল পাইনু॥
অবলা না গণে কিছু এমতি হইবে পিছু
তবে কি এমন প্রেম করে।
ভাল মন্দ নাহি জানে পরমুখে যেবা শুনে
সেই তো অনলে পুড়ি মরে॥
বড়ু চণ্ডীদাস কয় প্রেম কি অনল হয়
শুধুই সে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ এমতি দারুণ লেহ
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥

চণ্ডীদাসের পদগুলি ভক্তিসহ পাঠ করিলে উপাসনার প্রচুর সন্ধান পাওয়া যায়। মহাযোগীর লক্ষ্য,—উপাস্য দেবের রূপ-চিন্তন। এই ধ্যান প্রগাঢ় হইলে সমাধি হয়। সেই সমাধিতে উপাস্য বস্তুর নিরন্তর অবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারাবৎ স্মৃতিধারা প্রবাহিত হয়। প্রথমতঃ উহা স্ফূর্ত্তির ন্যায় প্রতিভাত হইতে থাকে। অবশেষে উহা সাক্ষাৎ ঈশ্বর দর্শনের

ন্যায় চিত্ত সমক্ষে উপাস্য বস্তুকে উপস্থাপিত করে। শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের নিম্ন লিখিত পদটীতে উহা জানিতে পারা যায় :—

কাহারে কহিব মনের বেদন
কেবা যাবে পরতীত
হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা
সদাই চমকে চিত॥
গুরু জন মাঝে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক্ নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥
সখীর সহিতে জলেরে যাইতে
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝল মল
তাহে কি পরাণ রয়॥
কুলের ধরম রাখিতে নারিনু
কহিনু সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাস শ্যাম সুনাগর
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥

উপাসনার নিগূঢ় মর্ম্ম এখানেই নিহিত আছে। ঈশা উপনিষদে জানা যায় সিদ্ধ পুরুষগণ সর্ব্ব জগতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেন। গীতার বহুস্থলেই সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাব দর্শন করার উপদেশ আছে। শ্রীভাগবতেও এইরূপ উপদেশের অভাব নাই। একাদশ স্কন্ধে ভাগবত ধর্ম্ম কথনে উহাই উত্তম ভক্তের লক্ষণ বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে :—

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম ।
সর্ব্বত্র হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি ।
যথা যথা দৃষ্টি চলে তথা কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি ॥

শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের পদে শ্রীমতীর উক্তিতে তাহাই বলা হইয়াছে ঃ— পুলকে আকুল, দিক্ নেহারিতে, শ্যামময় সব দেখি।" এই ভাবেই জ্ঞানীর ব্রহ্মদর্শন, যোগীর সমাধির ফল, ভক্তের ভগবদ্দর্শন এবং প্রেমিকার প্রেমমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দময় প্রেমরসবিগ্রহ-দর্শন ঘটে। শ্রীশ্রীরাসলীলাতেও তন্ময়ত্বের ভাব দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহা এরূপ নহে। এস্থলে উদ্দীপনা যে ভাবের ও ব্যাকুলতার বৃদ্ধি করে সে সম্বন্ধে শ্রীরাধার উক্তিতে পদটী অতি সুন্দর, উহা এই ঃ—

একে কাল হলো মোর নয়লি যৌবন ।
আর কাল হলো মোর বাস বৃন্দাবন ॥
আর কাল হলো মোর কদম্বের তল ।
আর কাল হলো মোর যমুনার জল ॥
আর কাল হলো মোর রতন ভূষণ।
আর কাল হলো মোর গিরি গোবর্দ্ধন ॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী ।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন ।
কার কোন দোষ নাই, সব একজন ॥

মহাপ্রভু বলিলেন, শ্রীমতীর হৃদয়ে বিগত সুখ স্মৃতির তরঙ্গমালা উদিত হইল, তাহার যাতনার ক্রমশ বৃদ্ধি পাইল। যে যে স্থানে এক

দিন প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা শ্রীগোবিন্দ-সঙ্গে তাঁহার আনন্দ, তরঙ্গে তরঙ্গে খেলা করিত, আজ শ্যাম-বিরহে সেই সকল স্থল ও বিষয় তাঁহার নিকট বিষবৎ হইয়া উঠিল। স্মৃতির এই ভীষণ দংশনে শ্রীরাধার চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল, হৃদয়ের স্তরে স্তরে সুখ-স্মৃতি গুলি দাউ দাউ জ্বলিতে লাগিল। এই পদের প্রত্যেক কথাই হৃদয়ের প্রগাঢ় প্রেমানুরাগ-বিস্ফুরণের সমুজ্জ্বল নিদর্শন। শ্রীযমুনা তটে, কেলিকদম্ব বনে, তটান্ত কুঞ্জের বিহগগুঞ্জনে, মৃদুল সমীরণে, এমন কি নিজের রতন-ভূষণেও শ্রীমতীর বিরহদগ্ধ প্রাণে শ্রীকৃষ্ণ বিলাসের স্মৃতি উদিত হইয়া তাঁহাকে বিকল করিয়া তুলিল।

স্বরূপ, এই সকল পদ শুনিলে হৃদয় সহজেই ব্যাকুল হইয়া উঠে—ধৈর্য্য ধরাই কঠিন। তুমি যখন পদটি গাইতেছিলে, তখন উহার প্রত্যেক কথাতেই সেই সেই লীলাস্থলীতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-বিলাসের কথা আমার মনে উদিত হইতেছিল, আর উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধারাণীর কৃষ্ণ-বিরহের যাতনা অতি প্রবল রূপেই আমি অনুভব করিতে ছিলাম।

স্বরূপ বলিলেন, প্রেমময় শ্রীরাধারাণীর বিরহ-যাতনার তো কুল কিনারা নাই, শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের পদও যেন সেইরূপ অফুরন্ত। এখন আরও দু'একটি পদ গাইতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন :—

কেন বা কানুর সনে পিরীতি করিনু।
না ঘুচে দারুণ লেহা ঝুরিয়া মরিনু॥
আর জ্বালা সইতে নারি কত উঠে তাপ।
বচনে না বাহিরায় বুকে খেলে সাপ॥

এইটুকু গাইতেই স্বরূপের কণ্ঠ স্তম্ভিত হইল, মহাপ্রভু অধোবদনে বিষণ্ণ ভাবে কি-জানি-কি ভাবিতে লাগিলেন—কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার

নয়ন হইতে দু'চার বিন্দু অশ্রু গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল ; অল্পক্ষণ পরে স্বরূপ মহাপ্রভুর শ্রীমুখপঙ্কজ দেখিয়া অধিকতর বিষণ্ণ হইলেন। প্রভু বলিলেন, তারপর, স্বরূপ !' স্বরূপ ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে আধ-আধ গদ্‌গদ ভাবে গাইতে লাগিলেন :—

১। কুল গেল, কলঙ্ক হলো ধরম গেল দূরে।
নিশি দিন মন মোর কানু লাগি ঝুরে॥
করমের দোষ রে জনমে কিবা করে॥
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে॥

২। যাহার সহিত যাহার পিরীতি
সেই সে মরম জানে।
লোক চরাচর ফিরিয়া না চাই
সদাই অন্তর টানে॥
গৃহ কর্ম্মে থাকি সদাই চমকি
গুমরে গুমরে মরি।
নাহি হেন জন করে নিবারণ
যেমত চোরের নারী॥
ঘরে গুরুজনা গঞ্জয়ে নানা
তাহা বা কাহারে কই।
মরণ সমান করে অপমান
বন্ধুয়ার লাগি সই॥
কাহারে কহিব কেবা নিবারিবে
কে জানে মরম দুখ।
চণ্ডীদাস কহে করহ ঘোষণা
তবে সে পাইবে সুখ॥

৩। ধিক্ রহু জীবনে যে পরাধীন জীয়ে।
তাহারে অধিক ধিক্ পরাধীন হয়ে॥
এপোড়া কপালে বিহি এমতি লিখিল।
সুধার সায়র মোর গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ করি কোলে।
পীরিতি-অনল-তাপে পাষাণ সে জ্বলে॥
ছায়া দেখি বসি যদি তরু লতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তনু তরু লতা সনে॥
যমুনার জলে গিয়া যদি দেই ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াব কি অধিক বাড়ে তাপ॥
অতএব এছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভক্ষিমু মুই এগরল বিষে॥
চণ্ডীদাস কহে দৈব গতি নাহি জান।
দারুণ পিরীতি মোর বধিল পরাণ॥

৪। কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
জনমে কি ফল পানু।
হিয়া দগ দগি পরাণ পোড়নি
মনের আগুনে মনু॥
গোকুল নগরে কেবা কিনা করে
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
হাম কলঙ্কিনী রাধা॥

এঘর করণ বিধি নিদারুণ
পিরীতি পরের দেশে।
হেন করে মন হউক মরণ
কত সহি অপযশে॥
বাহিরে বেরাতে লোক চরচাতে
বিষম হইল ঘরে।
পিরীতি বলিয়া যতেক বৈরী
আপন বলিব কারে॥
রাধা মেনে কেহ নাম নাহি লবে
এখানে এখনি ম'লে।
চণ্ডীদাস বলে সবারে পাইবে
বঁধু আপনার হ'লে॥

৫। কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পিরীতি॥
খাইতে না রুচে অন্ন শুইতে না চায় মন।
বিষ মিশাইল যেন এঘর করণ॥
পাসরিতে চাহি যদি পাসরা না যায়।
তুষের অনল যেন জ্বলিছে হিয়ায়॥
হাসিতে শ্যামের সনে পিরীতি করিয়া।
এবে নাহি যায় দিন মরি যে ঝুরিয়া॥
পিরীতি এমন জ্বালা জানিব কেমনে।
মিছে বাড়াইনু লেহা কালিয়ার সনে॥
পিরীতি গরলে মোর হেন গতি ভেল।
আছিল সোণার দেহ ঝামর হইল॥

তিলেক বিচ্ছেদ পাপ-পরাণ না সহে।
এমন পিরীতি দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে॥

৬। শিশুকাল হৈতে শ্রবণে শুনিনু
সহজ পিরীতি কথা।
সেই হ'তে মোর তনু জর জর
ভাবিতে অন্তর ব্যথা॥
দৈবের ঘটীতে বঁধুর সহিতে
মিলন হইবে যবে।
মান অভিমান দৈবের বিধান
ধৈরজ ভাঙ্গিবে তবে॥
জাতি কুল শীলে দিনু জলাঞ্জলি
ছাড়িনু পতির আশ।
ধরম করম সরম ভরম
সকলি করিনু নাশ॥
কুল-কলঙ্কিনী বলি দেয় গালি
গুরু পরিজনে মেলি।
কাতর হইয়া আদর করিয়া
লইনু কলঙ্ক ডালি।
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হয়ে পিরীতি করিলে
এমতি ঘটয়ে তারে॥
মুই অভাগিনী কেবল দুখিনী
সকলি পরের আশে।

আপনা যাইয়া পিরীতি করিনু
এবে সব লোক হাসে॥
চণ্ডীদাস কয় পিরীতি লক্ষণ
শুন গো বরজ-নারী।
পিরীতি ঝুলিটী কাঁধেতে করিয়া
পিরীতি-নগরে ফিরি॥

মহাপ্রভু বলিলেন স্বরূপ, এযে দেখিতেছি গঙ্গাযমুনার প্রবাহও তোমার পদগানের প্রবাহে হা'র মানে! বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই কেবল ঐ একটানা স্রোতের ন্যায় তোমার গীতি প্রবাহ অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে; কেহ শুনিল কি, না শুনিল তাহাতেও তোমার দৃক্‌পাত নাই। মধুমাধবের শ্যামল কাননে প্রমত্ত কোকিলকুলের ন্যায় তোমার ঐ কলকণ্ঠে শ্রীরাধাপ্রেমের অবিরাম স্রোত বহিয়া যাইতেছে।

স্বরূপ হাত জোড় করিয়া বলিলেন প্রভু অনেকবার এই আবেগ থামাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম, তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, কিন্তু পারি নাই—এখনও পারিব না। পাষাণ-বক্ষ বিদারণ করিয়া যখন আগ্নেয় গিরির প্রতপ্ত নিঃস্রব বাহির হয়, তখন উহার বেগ রোধ বড় সহজ নহে। বর্ষার তটিনীর ন্যায় আমার হৃদয় হইতে আপনি নিজেই আজ এই প্রবাহ প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাহাও অনুভব করিয়াছি। আপনার লীলা আপনি জানেন। আমি থামিতে পারিতেছি না আরও শুনুন ঃ—

কালার পিরীতি গরল সমান
না খায় সে থাকে সুখে।

পীরিতি গরল ভক্ষে যেই জন
তার জন্ম যায় দুখে ॥
আর বিষ খেলে তখনি মরণ
এ বিষে জীবন শেষ।
সদা ছট্‌ফট্‌ ঘুরনি নিপট
লটপটতার বেশ ॥
নয়নের কোণে চাহে যাহা পানে
সে ছাড়ে জীবনের আশ।
পরশ পাথর ঠেকিয়া রহল
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

২। পিরীতি পিরীতি সব জন কহে
পিরীতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল নহে তো পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা ॥
পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে (মন্ত্রে)
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন লভিল সে জন
বড় ভাগ্যবান্‌ সে ॥
পিরীতি লাগিয়া আপন ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে ॥

দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও*
থাকিলে পিরীতি আশ।
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

---

* ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত কবি Shelly তদীয় Epipsychidion নামক কাব্যেও প্রেমের এই অদ্বৈতভাবের উচ্চতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই :—

We shall become the same, we shall be one
Spirit within two frames, oh, wherefore two?
One passion in twin hearts.
One hope within two wills, One will beneath
Two overshading minds, one life, one death,
One heaven one hell, one immortality
And one annihilation।

কবিবর ভবভূতিও উত্তর রাম চরিতে প্রকৃত প্রীতির এই উচ্চ আদর্শ জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন :—

অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যদ্।
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা স্নেহান্নহার্য্যোরসঃ॥ ইত্যাদি

ফলতঃ প্রকৃত প্রীতিতে প্রণয়ি-প্রণয়িনীর সুখ দুঃখ ভালমন্দ এক হইয়া যায়। একের সুখে অপরের সুখ, একের দুঃখে অপরের দুঃখ অভিন্নভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। চণ্ডীদাসের এই পদটীতে প্রেমের অদ্বৈত ভাব অতীব পরিস্ফুট রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সহজ সরস সরল কথায় প্রীতির উচ্চতম তত্ত্ব প্রকাশ করিতে শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের নৈপুণ্য অবিসম্বাদিত। প্রসন্ন সলিল গঙ্গা যমুনার প্রবাহের ন্যায় চণ্ডীদাসের পদ-কাব্যের প্রবাহ

(অপর পৃষ্ঠে নিম্নে দেখুন)

শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের পদাবলীর কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইল। এখন শ্রীপাদ বিদ্যাপতির পদাবলীর আরও দুই চারিটী পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। শ্রীমতীর অভিসারের বর্ণনা এইরূপ :—

নব অনুরাগিণী রাধা। কছু নাহি মানয়ে বাধা ॥
একলি করল পয়ান। পন্থ বিপথ নাহি মান ॥
তেজল মনিময় হার। উচ কুচ মানয়ে ভার ॥
কর সঙ্গে কঙ্কন মুদরি। পন্থহি তেজল সগরি ॥
মণিময় মঞ্জরী পায়। দূরহি তেজি চলি যায় ॥
যামিনী ঘন আন্ধিয়ার। মন মথে হেরি উজিয়ার ॥
বিঘিনি বিথারিত বাট। প্রেমক আয়ুধ কাট ॥
বিদ্যাপতি মতি জান। ঐছে না হেরি আন ॥

অভিসারের আর একটি পদ অতি সুন্দর। শ্রীমতী জ্যোৎস্না রাত্রিতে পুরুষ বেশে অভিসার করিতেছেন :—

অবহুঁ রাজ পথে পুরুজন জাগি।
চাঁদ কিরণ জগমণ্ডলে লাগি ॥

কবি সমাজে একবারেই অদ্বিতীয়। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে প্লেটো, ফিক্‌টে, লোটজ্‌ প্রভৃতি অনেকেই প্রীতিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য কবিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই প্রীতির সম্বন্ধে বহু চিত্তাকর্ষি তথ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। মাইকেল এঞ্জেলোর উক্তি অনেক স্থলেই বৈষ্ণব দার্শনিকগণের উক্তির ন্যায় উচ্চ কথায় পূর্ণ। পারস্যের সুফী কবিগণও বৈষ্ণবদের ন্যায় প্রীতিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে জালালুদ্দিন, রুমি তদীয় মসনবী গ্রন্থেও প্রেমের উচ্চতত্ত্ব প্রকটন করিয়াছেন। বৈষ্ণব দার্শনিকদের প্রীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিতে হইলে প্রীতি সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

রহিতে সোয়াথি নাহি নৌতুন লেহ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহ ॥
কামিনী করল কতয়ে প্রকার।
পুরুষক বেশে করল অভিসার ॥
ধম্মিল পোল ঝুট করি বন্ধ।
পহিরণ বসন আনহি করছন্দ ॥
অম্বরে কুচ নাহি সম্বর গেল।
বাজন যন্ত্র হৃদয়ে করি নেল ॥
ঐছন মিলন কুঞ্জক মাঝ।
হেরি না চিহ্নই নাগর রাজ ॥
হেরইতে মাধব পড়লহু ধন্দ।
পরশিতে ভাঙ্গিল হৃদয়ক ঘন্দ ॥
বিদ্যাপতি কহ কিয়ে ভেলি।
উপজল কত কত মনমথ-কেলি ॥

মহাপ্রভু এই পদটী শুনিয়া বলিলেন, স্বরূপ সুরসিক বিদ্যাপতির বসন্ত বর্ণনটী শ্রীরূপকে শ্রবণ করাও।” স্বরূপ পদ ধরিলেন ঃ—

১। আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবীপন্থ ॥
দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড।
কেশর কুসুম ধরল হেমদণ্ড ॥
নৃপ আসনে নব পিঠল পাত।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরি মাথ ॥
মৌলি রসাল মুকুল ভেল ভায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায় ॥

শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পড়ু আশীষ মন্ত্র ॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ।
মলয় পবন সহ ভেল অনুরাগ ॥
কুন্দ বিল্লীতরু ধয়ল নিশান।
পাটল তুণ, অশোকদলবাণ ॥
কি শুক লবঙ্গ লতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ।
সৈন্য সাজল মধু মক্ষিকা কুল।
শিশিরক সহহুঁ করলু নিরমূল ॥
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ ॥
নিজ নব দলে করু আসন দান ॥
নব বৃন্দাবন রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার ॥

২। নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ
নব নব বিকসিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল ॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দী পুলিন কুঞ্জ নব শোভন
নব নব প্রেম বিভোর ॥
নবীন রসাল চিত উনমাতই
নব রসে কাননে ধায় ॥

নব যুবরাজ নবীন নব নাগরী
মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি ॥

শ্রীল রূপগোস্বামিমহোদয় অতীব আহ্লাদিত হইয়া শ্রীপাদ রূপকে বলিলেন,ঠাকুর বিদ্যাপতির বসন্ত বর্ণন অদ্ভুত মাধুর্য্যময়। ইহা শ্রীপাদ জয়-দেবের গীতগোবিন্দের বসন্ত বর্ণনের কথা স্মৃতিপথে জাগাইয়া তোলে। এই সকল পদের আবৃত্তি শুনিলেই হৃদয় বৃন্দাবনের রস-মাধুর্য্যে পরিসিক্ত হয়। তাহার উপর আবার আপনার সুধাময় কণ্ঠে তান-মান-লয় সহ এই গান-শ্রবণে মনে হইতেছে যেন দিব্য নেত্রে বাসন্ত বৃন্দাবন-শোভা প্রত্যক্ষ করিতেছি। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পদতলে স্থান পাইয়াই আমি ধন্য হইয়াছি। তাহার পরে শ্রীল রায় মহাশয়ের সঙ্গ-লাভ এবং আপনার শ্রীমুখের এই অমৃতময় পদগানে এই ক্ষুদ্র অধমের জীবন সার্থক বলিয়া বোধ করিতেছি।

স্বরূপ বলিলেন, শ্রীল বিদ্যাপতির কৃত একটি অনুভব পদ গাইতেছি—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
জনম অবধি হাম ওরূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনমু
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল ॥
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব—কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক ॥

এখন মানের পদ গাইতেছি, শুনুন,—

তোহারি বিরহ বেদনে বাউর
সুন্দর মাধব মোর।
ক্ষণে সচেতন ক্ষণে অচেতন
ক্ষণে নাম ধরে তোর ॥
রাধা হে তো বড় কঠিন দেহ।
গুণ অপগুণ না বুঝি তেজবি
জগত-দুলহ গেহ ॥
তোমারি কাহিনী কহিতে জাগল
শুনই দেখই তোয়।
না ঘর বাহিরে ধৈরজ না ধরে
পথ নিরখই রোয় ॥
কত পরবোধি না মানে রহসি
না করে ভোজন পান।
কাঠ মুরতি ঐছন আছয়ে
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥

মহাপ্রভু বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার অবস্থা যেরূপ, শ্রীরাধার বিরহেও শ্রীকৃষ্ণের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। বিদ্যাপতির মান-বর্ণন অতি

চমৎকার। ইহাতে সখীদের প্রবোধনাও চিত্তাকর্ষিণী। বোধ হয় মানের পদগান-শ্রবণে তোমার ইচ্ছা উত্তরোত্তর বলবতী হইতেছে। স্বরূপ বলিলেন হাঁ প্রভো! আরও শুনুন :—

দিবস তিল আধ রাখবি যৌবন
বহুই দিবস যাব
ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলি যায়ব
পরউপকার সোই লাভ ॥
সুন্দরি হরিবধে তুঁহু ভেলি ভাগী
রাতি দিবস সোই আন নাহি ভাবই
কাল-বিরহ তুয়া লাগি ॥
বিরহ সিন্ধু মাহা ডুবইতে আছয়ে
তুয়া কুচকুম্ভ লখি দেই।
তুহু ধনী গুণবতী উদার গোকুলপতি
ত্রিভুবন ভরি যশ লেই ॥
লাখ লাখ নাগরী যো কানু হেরই
সো শুভদিন করি মান।
তুয়া অভিমান লাগি সোই আকুল
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥

সখীর এই অনুনয়ের প্রত্যুত্তরে শ্রীমতী বলিলেন—

১। সজনি না বোল বচন আন।
ভালে ভালে হাম অলপে চিনিনু
যৈছন কুটিল কাণ ॥
কাঠকঠিন কয়ল মোদক
উপরে মাখিয়া গুড়।

কনয়া কলস বিখে পুরাইয়া
উপরে দুধক পুর ॥
কানু সে সুজন হাম দুরজন
তাহার বচনে যাই।
হৃদয় মুখেতে এক সমতুল
কোটিকে গুটিক পাই ॥
যে ফুলে সেজসি সে ফুলে পূজসি
সে ফুলে ধরসি বাণ।
কানুর বচন ঐছন চরিত
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥

২। হরি পরসঙ্গ না কর মঝু আগে।
হাম নহ নায়রী ভয়া মাধব লাগে ॥
যাকর মরমে বৈঠে বর নারী।
তা সঞে পিরীতি দিবস দুই চারি ॥
পহিলহি না বুঝনু এত সব বোল।
রূপ নেহারি পড়ি গেনু ভোল ॥
আন ভাবিতে বিধি আন কয় দেল।
হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল ॥
এ সখি এ সখি ধর রহু জীব।
হরিদিকে চাহি পানি নাহি পীব ॥
হাম যদি জানতু কানুক রীত।
তবে কিয়ে তা সঞে বাঁধিয়ে চিত ॥
হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম্ব-বিবাধ।
তবহুঁ ব্যাধক গীত শুনি করু সাধ ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
পানি পিয়ে কিবা জাতি বিচারি॥

সখি আমার সম্মুখে হরির কথা তুলিও না। আমি তোমার ঐ মাধবের জন্য নাগরী হই নাই। উহার এমনই রীতি, যে সে যাহার মরমে প্রবেশ করে, ডুইচারি দিবসের জন্যও তাহার সহিত প্রেম রাখে না। আমি উহার বাক্য প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। কেবল রূপ দেখিয়াই ভুলে পড়িয়া গেলাম। ভাবিলেম এক ;—বিধাতা করিলেন আর! আমি ভাবিলাম শ্যাম আমার গলার হার ; শেষে দেখি এতো হার নয়—এযে ভীষণ বিষধর ভুজঙ্গ! সখি, যতদিন জীবন রহিবে উহার দিকে চাহিয়া জলটুকু পর্য্যন্ত খাইব না। যদি উহার রীতি জানিতাম, তবে উহাতে চিত্ত আবদ্ধ করিতাম না। হরিণী ব্যাধের কার্য্য জানে, ব্যাধ যে উহার সহচর সহচরীদের প্রাণহরণ করে তাহা সে নিজ চক্ষে দেখে, দেখিয়াও সরল চিত্তে দাঁড়াইয়া ব্যাধের গীত শুনিতে সাধ করে। (আমারও সেই দশা হইল।) বিদ্যাপতি বলেন, ওগো বরনারি আগে জল পান করিয়া পরে তুমি কি জাতির বিচার করিতেছ?

গান শুনিয়া শ্রীরূপ বলিলেন—মহাত্মন্, বিদ্যাপতি ঠাকুরও ধন্য কবি। এই পদগুলিতে আমার হৃদয়ে যে কি আনন্দ অনুভব করিতেছি, তাহা অবর্ণনীয়। প্রভুর আদেশ ও আপনার কৃপা হইলে মানের আরও পদ শুনিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

মহাপ্রভু বলিলেন—"অমৃতে অরুচি কার? স্বরূপের ভাণ্ডারেই বা অভাব কিসের?" স্বরূপ বলিলেন, অভাব কেবল ভাবের? আপনার কৃপা হইলে কিছুরই অভাব থাকে না। ভাবভক্তি সহজেই হৃদয়ে উদিত হয়। তবে শুনুন:—

১। বুঝিনু এ সখি কানু গোঙার।

পিতল কাটারী কামে নাহি আয়ল
উপরহি ঝকমকি সার॥

আখি দেখাইতে কোপে ধাসা খসল
কাহে গহন দুই বাটে।

চন্দন ভরমে শিমলী আলঙ্গিনু
শেল রহল হি কাঁটে॥

পশুক মোঝে যো জনম গোঙাইল
সো কিয়ে জানয়ে রতিরঙ্গ।

মধুযামিনী আজু বিফলে গোঙাইনু
গোপ গোঙারক সঙ্গ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনয়ে যুবতী
সো থির নহে গোঙারে।

তহু গোঙারিণী সহজে আহিরিণী
সো হরি না করু পুছারে।

শ্রীরাধা বলিতেছেন, সখি আমি বুঝিতে পারিয়াছি, কানু গোঁয়ার। শ্যাম আমার কোন কাজে আসিল না। পীতলের কাটারীর ন্যায় উহার উপরেই চক্‌মকি, উহাতে যে প্রেমের কোনও ধার নাই। ক্রোধে নেত্র আরক্ত করা মাত্রই দুইপথে গিরি খসিয়া পড়িল। আমি চন্দন ভ্রমে শিমুল বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়াছিলাম। এখন উহার কাঁটায় সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে। পশুর সমাজে যে জীবন অতিবাহিত করে, সেকি কখনো রতিরঙ্গ জানে? গোপগোঁয়ারের সঙ্গ করিতে গিয়া এমন মধুযামিনী বিফল হইয়া গেল। বিদ্যাপতি বলেন সে মাধব স্থিরই আছে, তুমি আহিরিণী, গোপবালা, তুমিই গোঙারিণী, তুমি শ্যামসুন্দরকে জিজ্ঞাসা করিতেছ না।

২। কাঞ্চন জ্যোতি কুসুম পরকাশ।
রতন ফলিবে বলি বাঢ়ায়নু আশ?
তাকর মূলে দিনু দুধক ধার।
ফলে কিছু না হেরিনু ঝলমলি সার॥
জাতি গোয়ালিনী হাম মতিহীন।
কুজনক পিরীতি মরণ অধীন॥
হা হা বিধি মোরে এত দুখ দেল।
লাভক লাগি মূল ডুবি গেল॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরকে লাঙ্গুল নহত সমান॥

মহাপ্রভু বলিলেন স্বরূপ, শ্রীমতীর প্রণয়-কোপ ভীষণ কটুভাষায় পরিণত হইয়াছে। বুঝিতে হইবে তাঁহার প্রেম অতীব প্রগাঢ়। প্রেম যেখানে প্রগাঢ়, সেখানে ভদ্রতা শীলতা ও সৌজন্য অল্প কারণেই বিনষ্ট হয়। যাহা হউক, ইহা শুনিয়া তাঁহার সখী কি বলিলেন? স্বরূপ কহিলেন, সখী ইহাতে দুঃখিতা হইয়া শ্রীমতীকে বলিলেন :—শ্রীরাধে, বিধাতা তোমার সকল শরীর সুকোমল কুসুমে নির্ম্মিত করিয়া হৃদয়টা কি পাষাণে গড়িয়া দিল? ইহার উত্তরে শ্রীমতী বলিলেন :—

সুন্দর কুলশীল ধনিবর যুবক
কি করব লোচন হীনে।
কি করব তপজপ দানব্রত আদিক
যদি করুণা নাহি দীনে॥
এ সখি বুঝিয়ে কহসি কটুবাণী।
ঐছন এক গুণ বহু দোষ নাশই
এক দোষে বহুগুণ হানি॥

গরল-সহোদর গুরুপত্নীহর
রাহু বদন উগারা।
বিরহ-হুতাশন বারিকি নাশন
শীলগুণে শশী উজিয়ারা॥
পরসুতে অহিত যতন নাহি নিজ সুতে
কাক উচ্ছিষ্ট রস পানি।
সোসব অবগুণ ঢাকল এক পিকা
বোলত মধুরিম বাণী॥
কানুক পিরীত কি কহব এ সখী
সব গুণ মূল অমূলে।
বংশী পরশি শপথি শত শত
তবহি প্রতীত নাহি বোলে॥
পুন পরিরম্ভণ চুম্বন কোরে করি
সঙ্কেত করি বিশোয়াসে।
আন রমণী সঙ্গে সো নিশি বঞ্চল
মোহে করিয়া নিরাশে॥
অনল অধিক মো তনু দহই
রতি চীন দেখি প্রতি অঙ্গে।
বিদ্যাপতি কহ জীউ নিকসব
তবহি না মিল হার সঙ্গে॥

সখি, কানুর গুণের কথা কি বল, এক দোষে উহার সকল গুণই নষ্ট হইয়া যায়। যদি কোন যুবক ব্যক্তি দেখিতে সুন্দর হয়, কুলে শীলে ও মাননীয় হয়, কিন্তু সে যদি অন্ধ হয়, তবে তাহার এই সকল গুণও অকর্ম্মণ্য বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। আবার কোন ব্যক্তি যদি তপজপ

দান ব্রতাদিতে ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত হয় কিন্তু তাহার যদি দীনের প্রতি করুণা না থাকে, তবে তাহাকে প্রকৃতপক্ষে ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। সখি তুমি বিচার করিয়া আমাকে পাষাণী বলিও। কখন কখন এক গুণে বহু দোষ নষ্ট হয়, আবার কখন কখন এক দোষেও বহুগুণের নাশ করে। অপর পক্ষে সমুদ্রমন্থন সময়ে চন্দ্র ও গরল এক সমুদ্র গর্ভজাত। এইজন্য চন্দ্রকে গরল-সহোদর বলা হইয়াছে। এই চন্দ্র গুরু-পত্নী অর্থাৎ বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করে, রাহুর মুখ হইতে উচ্ছিষ্টবৎ উদগীর্ণ হয়। ইহা ছাড়া বিরহিণীর পক্ষেও চন্দ্র অনলবৎ। উহাকে দেখিয়া পদ্মিনীও ম্লান হইয়া পড়ে। তথাপি শীতলতা গুণে চন্দ্র সকলের আনন্দদায়ক ও সমুজ্জ্বল। চন্দ্রের এক গুণে উহার বহু দোষ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ কোকিলেরও বহু দোষ,—যেমন, কাকের বাসায় নিজে ডিম্ব প্রসব করে, কাকের সুতের প্রতি বিদ্বেষ করে, নিজে ডিম্ব প্রসব করিয়া তাহার কোনও খবর লয় না, কাকের উচ্ছিষ্ট পান করিয়া শৈশবে প্রতিপালিত হয়। কিন্তু এক মধুর ভাষাই উহার এই সকল দোষ ঢাকিয়া ফেলে। সখি, কানুর কথা আর কি বলিব! বংশী স্পর্শ করিয়া শত শত শপথ করিলেও উহার কথায় বিশ্বাস নাই। উহার দৃঢ় আলিঙ্গন, প্রেম মাখা চুম্বন প্রভৃতিও বৃথা। উহার সঙ্কেতে বিশ্বাস করিয়া সঙ্কেত স্থানে গমন করিলাম শঠ আমাকে নিরাশ করিয়া অপরের সঙ্গে রজনী যাপন করিল। উহার প্রতি অঙ্গে রতি চিহ্ন দেখিয়া আমার অঙ্গ অনলের অধিক জ্বলিতেছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—ঠিক কথা, জীবন গেলেও তুমি আর উহার সঙ্গ করিও না।" স্বরূপ বলিলেন, প্রভো বিদ্যাপতির হৃদয়ও সখীর ন্যায় শ্রীরাধার দুঃখে দুঃখী। তাই তিনি শ্রীরাধার মর্ম্মবেদনা শুনিয়া এরূপ উপদেশ দিলেন।'

সখী শ্রীরাধার উক্তি শুনিয়া বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণেরই দোষ। উনি

তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইয়া বলিলেন শ্রীরাধা বলিলেন মানময়ী শ্রীরাধা তাঁহাকে আর দর্শন দিবেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্যামভাবিনী শ্রীরাধিকার মানের বেগ প্রশান্ত হইল। সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন সখি সে শঠ লম্পট পরঘরিয়া কুলাগর কোথায় গেল? সে যেমনই হউক, কিন্তু এ নির্লজ্জ পোড়া প্রাণ যে তাহারই জন্য আনছান করিতেছে। সখী বলিলেন, তুমি যেমন বলিয়াছিলে আমিও উহাকে সেইরূপ কটুবাক্যে ভৎর্সনা করিলাম, স্পষ্টতঃই বলিয়াছিলাম, শ্রীমতী আর তোমার মুখ দেখিবেন না—তোমার কোন চেষ্টাই সফল হইবে না। ইহা শুনিয়া শ্যামসুন্দর সজল নয়নে বিষণ্ণ চিত্তে রোদন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। সখীর বাক্যে কমলিনীর কোমল হৃদয় একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি বলিলেন, সখি ভাল কাজ কর নাই, সে যে বড় আদরের ধন—এখন উপায় কি বল। এই বলিয়া শ্রীরাধা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন :—

চরণ-নখরমণি-রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটায়ল গোকুলচাঁদ॥
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন-লোর।
কতনা মিনতি কয়ল পহু মোর॥
লাগল কুদিন জাম কয়লু মান।
অব নাহি নিকশয়ে কঠিন পরাণ॥
রোখ তিমির এত বৈরী কি জান।
রতনক ভৈগেল গৈরিক ভাণ॥
নারী জনমে হাম না করিনু ভাগি।
মরণ শরণ ভেল মান কি লাগি॥

বিদ্যাপতি কহ শুন ধনী রাই।
রোথয়ি কাহে মোহে সমুঝাই॥

প্রভু বলিলেন স্বরূপ, কলহান্তরিতার এই সুবিখ্যাত পদটি বাস্তবিকই হৃদয়-বিদারক। তারপরে কিরূপে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন হইল? স্বরূপ বলিলেন, প্রভু শ্রীরাধার এইরূপ বিলাপ শুনিয়া সখী অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে শ্রীরাধা-সমীপে লইয়া আসিলেন। তখন আবার শ্রীরাধার কোপভাব প্রকাশ পাইল—তিনি বলিলেন :—

তুহু যদি মাধব চাহসি লেহ।
মদন সাখী করি খত লিখি দেহ॥
ছোড়বি কোপ-কদম্ব বিলাস।
দূরে করবি নিজ গুরুজন-আশ॥
মোবিনে স্বপনে না হেরবি আন।
হামারি বচনে করবি জলপান॥
রজনী দিবস গুণ গাওবি মোর।
আন যুবতী কোই না করবি কোর॥
ঐছন কবচ ধরব যব হাত।
তবহু তুঁয়া সঞে গরমক বাত॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরকান।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ॥

শ্রীশ্রীরাধারাণী এবার প্রকৃতই মহারাণীর ভাব ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোনও কথাটি না বলিয়া তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, প্রেমময়ি, তোমার পায়ে পড়িয়া বলিতেছি আর কখনও তোমার অসন্তোষজনক কার্য্য করিব না—তোমা ছাড়া কাহার প্রতি ফিরিয়া চাইব না। এই

বলিয়া আলতা লইয়া শ্রীরাধারাণীর চরণে লিখলেন—"তোমার চরণ-দাস শ্রীকৃষ্ণ।

প্রাণবন্ধুর এই কাতর দৈন্যে শ্রীমতীর কোমল হৃদয় একবারেই গলিয়া গেল। তিনি আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া শ্যামবন্ধুয়ার চরণতলে বসিয়া বলিলেন :—

আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহাইনু
পেখিনু পিয়ামুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানিনু
দশদিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানিনু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকুল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোহ কোকিল কুল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখবাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব সো ন যবহু মোহে পরি হোয়ত
তবহু মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥

শ্রীমতী আনন্দে উল্লসিত হইয়া সখীকে বলিলেন :—

১। কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর?

পাপসুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়ামুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূরদেশে না পঠাই॥
শীতের উড়নী পিয়া গীরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরীয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
সুজনক দুখ দিবস দুইচারি॥

শ্রীশ্রীরাধামাধবের সুখসম্মিলনে সুরসিক কবিবর সানন্দে বলিতেছেন :—

১। চিরদিন সো বিহি ভেল অনুকূল।
দুহু মুখ হেরইতে দুহু সে আকুল॥
বাহু পসারিয়া দুঁহে দুহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃত দুহু মুখ ভরু॥
দুহু জন কাঁপয়ে মদনক বচনে।
কিঙ্কিণী রোল করত পুন সঘনে॥
বিদ্যাপতি অব কি কহব আর।
যৈছে প্রেম দুহু, তৈছে বিহার॥

১। দুহার দুলহ দুহু দরশন ভেল।
বিরহ জনিত দুখ সব দূরে গেল॥
করে ধরি বসাওল বিচিত্র আসনে।
রময়ে রতন শ্যাম রমণী রতনে॥
বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ।
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ॥

উপসংহারে শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের আরও দুই একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীমতী রাধিকার আক্ষেপানুরাগের পদগুলিতে শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের পদকাব্যের মাধুর্য্য অধিক পরিমাণে আস্বাদিত হয়। এখানে ঐ ভাবাত্মক একটি পদ দিয়া অবশেষে মিলনের পদে উপসংহার করিতেছি। উক্ত পদটী এই :—

জনম গেল পরদুখে কত না সহিব।
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব॥
অন্তরে রহিল ব্যথা কুলে কি করিবে।
অনুরাগে কোন দিন গরল ভখিব॥
মনেতে করেছি কুলে দিব তিলাঞ্জলি।
দেশান্তরী হব গুরুদিঠে দিয়া বালি॥
ছাড়িনু গৃহের সাধ কানুর লাগিয়া।
পাইনু চরিতফল আগে না বুঝিয়া॥
অবলা কি জানে পাছে হইবে গো পাছে।
তবে কি এমন প্রেম করিতাম যেঁচে॥
ভালমন্দ না ভাবিয়ে সঁপেছি হে মন।
তেই সে অনলে পুড়ি যাইছে জীবন॥
চণ্ডীদাস কয় প্রেম হয় সুধাময়।
ভাগ্যফলে অমৃতেতে বিষ উপজয়॥

সুদীর্ঘ বিরহের পরে মিলন অতি মধুর। মহাপ্রভু বলিলেন, স্বরূপ শ্রীপাদ বিদ্যাপতির মিলন-পদমাধুরী শুনায়েছ, এখন শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের মিলনের পদ শুনিতে সাধ হইতেছে। প্রভুর আদেশে স্বরূপ গাইলেন :—

শ্যামবামে বৈঠল কিশোরী।
মেঘে যেন মিশয়ে বিজুরি॥

সোণার কমলে মধুকর।
তেমতি সাজল কলেবর॥
দুহুরূপ না যায় কথন।
কোটি কোটি মুরছে মদন॥
সহচরী কুঞ্জ নিকেতনে।
কেহ করে চামর ব্যজনে॥
কেহবা চন্দন দিছে গায়।
কেহ চুয়া তাম্বুল যোগায়॥
কেহ করে পাখা মৃদু বায়।
চণ্ডীদাস দুহু গুণ গায়॥

প্রভু বলিলেন সংক্ষেপতঃ এই পদটী অতিসুন্দর। স্বরূপ বলিলেন শ্রীপাদ চণ্ডীদাস সকল প্রকার ভাববর্ণনেই সিদ্ধ কবি। মিলন-মাধুর্য্য ও মিলন-শোভা-বর্ণনেও ইহার অনেক পদ আছে। প্রভু বলিলেন, শ্রীরূপকে তোমার পদাবলী শুনাইতে আমার বড় সাধ ছিল। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী প্রেমরসামৃতের অফুরন্ত অসীম অনন্ত মহাসিন্ধু। ইহার উপরে আবার তোমার কলকণ্ঠে ভাবময় কীর্ত্তনের সুধাক্ষরণ—যেন অমৃতের উপরে অমৃত!

শ্রীরামরায় বলিলেন—তাহার উপরে আবার আপনার শ্রীচরণতলে বসিয়া আপনার শ্রীমুখদর্শন করিতে করিতে শ্রীপাদ স্বরূপের গানশ্রবণ—ইহা আবার একযোগে কোটি সিন্ধুর বিরাট্ বিপুল সমাশ্রয়। এমন সুবর্ণ সুযোগ বিধাতার এক অনির্ব্বচনীয় দান।

শ্রীরূপ সজলনয়নে মৃদু-মধুর কণ্ঠে প্রগাঢ় ভক্তিভরে বলিলেন—শ্রীগম্ভীরামন্দিরের এই নিত্য লীলা-রসাস্বাদনে আপনারা কৃপা করিয়া আমার যে কিঞ্চিৎ অধিকার দিয়াছেন, এ জীবনে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য

আর কিছুই নাই। হায়, এ আনন্দ আমার অল্পদিন স্থায়ী। কেননা প্রভুর আদেশে অচিরে শ্রীবৃন্দাবনে প্রস্থান করিতে হইবে। কিন্তু এ আনন্দ এ হৃদয়ে চিরদিনের তরে অঙ্কিত থাকিবে।

মহাপ্রভু বলিলেন শ্রীরূপ, তুমি নিজেও শ্রীবৃন্দাবন মহাকাব্যরসের মহাকবি। শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাস্বাদনে তোমার যেমন অধিকার, এবং ইহাতে তোমার যে আনন্দানুভব হয়, অপরের পক্ষে তাহা একবারেহ সুদুর্ল্লভ। এই নীলাচলে অবস্থান করিয়াও আমি স্বরূপ ও রামরায়ের কৃপায় ব্রজরসের সুধামাধুরী অনুভব করিয়া জীবন ধারণ করি। এখানে ইঁহারাই আমার জীবন-রক্ষক। নচেৎ নিদারুণ বিরহে আমার যে কি দশা হইত তাহা বলিতে পারি না। তোমাকে যে আমার আস্বাদ্য এই ব্রজলীলামাধুর্য্যময় পদাবলীর আস্বাদন দিতে পারিলাম, ইহাতে তোমার ন্যায় আমার মনেও পরম আহ্লাদ হইল।

শ্রীরূপ প্রণত হইয়া বলিলেন এ দাস যদিও প্রভুর আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিবে, কিন্তু আপনাদের শ্রীচরণ নখজ্যোতি যেন চিরদিনই এ নয়নে লাগিয়া থাকে, আর শ্রীগম্ভীরা-মন্দিরের এই পদগীতির সুধা-ঝঙ্কার যেন চিরদিনই কর্ণরন্ধ্রে বিরাজ করে, এই আশীর্ব্বাদ করিবেন।

মহাপ্রভু বলিলেন—"তথাস্তু।"

সমাপ্ত

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় প্রণীত গ্রন্থাবলী।

গ্রন্থের নাম	মূল্য
শ্রীমৎ রূপসনাতন-শিক্ষামৃত (১ম খণ্ড)	৪৲
ঐ (২য় খণ্ড)	৪৲
শ্রীরায় রামানন্দ	৩৷৷০
শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী	৩৲
গম্ভীরায়শ্রীগৌরাঙ্গ	৩৲
শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া	৩৲
শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনী মূল ও সটীক বঙ্গানুবাদ	২।০
আত্মনিবেদন	২৲
নীলাচলে ব্রজমাধুরী	১।০
শ্রীশ্রীগোপীগীতা	১।০
চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি	১।০
শ্রীমৎ দাসগোস্বামী	১।০
শ্রীমৎ স্বরূপদামোদর	১।০
শ্রীশ্রীনামমাধুরী	১৲
সাধন-সঙ্কেত	১৲
শ্রীচরণতুলসী	১৲
অদ্বৈতবাদ	১৲
আনন্দমীমাংসা	৸০

প্রাপ্তিস্থান :—
২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ "নলিনী-প্রেস" হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত